Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

অষ্টম বর্ষ ❖ সংখ্যা ১ ❖ অগাস্ট ২০১৮

■ স্টিফেন হকিং ঃ জীবন ও কৃতি

সূর্যকে ছুঁতে রওনা হল নাসার মহাকাশযান পার্কার সোলার প্রোব

■ নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং দেশহীন মানুষ

■ ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এবং পুরাণ কাহিনী

■ কৃষির অভাবনীয় উন্নতি কৃষকদের জীবনে উন্নতি ঘটিয়েছে কী?

■ শ্রমজীবী মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বস্তুবাদের অনুশীলন করেন

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

সম্পাদকীয় ঃ	নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং দেশহীন মানুষ	৩
সমাজ দর্পণ ঃ	দিল্লী, মেখলিগঞ্জ, ঝালদা ... এই অনাহারে মৃত্যু মিছিলের শেষ কোথায়?	৫
	দুঃসাহসিক অভিযানে গুহার নিচে আটকে থাকা ফুটবল দল উদ্ধার	৬
	বে-আইনী কারখানা বন্ধের দাবিতে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশের গুলি	৭
	মাদার টেরিজা'র মিশনারিস অফ চ্যারিটির স্বরূপ উন্মোচিত	৭
বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ	সূর্যকে ছুঁতে রওনা হল নাসার মহাকাশযান পার্কার সোলার প্রোব	৮
	ভারতে প্রযুক্তিকে দর দেওয়া হয়, বিজ্ঞানকে করা হয় অবহেলা	৯
	এই প্রথম মহাকাশে নতুন গ্রহ'র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন বিজ্ঞানীরা	৯
	মশাকে বন্ধ্যা করে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া নির্মূল করার গবেষণা	৯
	ভূমিকম্পের পূর্বাভাসকেন্দ্র গড়া হচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে	১০
	কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের ঘোষণা গঙ্গার জল কোথাও বিশুদ্ধ নয়	১০
	আই পি সি সি-র বিশ্ব উষ্ণায়ণ তত্ত্ব আবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন	১১
	চাঁদের মাটিতে নিশ্চিতভাবে জলের সন্ধান মিলল	৩৬
কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ	মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারে ভগবান ক্রদ্ধ হয়ে বন্যা সৃষ্টি করেছেন!	১২
	ভগবানের সর্দি হয়েছে গোলযোগ সইতে পারেন না	১৩
	"লাজে রাঙা হল ব্যাঙি বউ গো/মালা বদল হবে ব্যাঙা'র সাথে"	১৩
	'কমিউনিস্ট' সীতারাম ইয়েচুরির মাথায় পূজার কলস!	৩৪
বিশেষ রচনা ঃ	ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এবং পুরাণ কাহিনী	১৪
স্মরণ ঃ	স্টিফেন হকিং ঃ জীবন ও কৃতি	২০
প্রবন্ধ ঃ	কৃষির অভাবনীয় উন্নতি কৃষকদের জীবনে উন্নতি ঘটিয়েছে কী?	২৩
	শ্রমজীবী মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বস্তুবাদের অনুশীলন করেন	২৬
বিজ্ঞানের খবর ঃ		৩০
সংগঠন সংবাদ ঃ		৩৩

সম্পাদকীয়

নাগরিক পঞ্জিকরণ এবং দেশহীন মানুষ

গত ৩১শে জুলাই ২০১৮, অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC)-দ্বিতীয় তথা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই NRC বা National Register of Citizens of India তালিকায় নাম বাদ পড়ায় অসমের বহু মানুষ মুখ্যত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে মদত দিচ্ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং মিডিয়ার একাংশ।

এখন প্রশ্ন হল, দেশের অন্য কোন রাজ্যে না থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয় নাগরিক পঞ্জি শুধুমাত্র অসম রাজ্যে হল কেন? স্বাধীনতার নামে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় পাকিস্তান থেকে বহু অমুসলীম (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন প্রভৃতি) ভারতে চলে আসে। এই বাস্তুহারাদের একটা বড় অংশ অসম রাজ্যেও চলে আসে। অসম রাজ্যে তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু হিন্দু বাঙালি চলে আসায়, অসমে মূল নিবাসী অসমীয়দের থেকে বাঙালিদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অসমীয়দের কয়েকটি সংগঠন 'বঙাল খেদাও' আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন তীব্র হলে কেন্দ্র সরকার ও অসম রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থির হয় ভারতের সংবিধান প্রবর্তন হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ২৫শে জানুয়ারি ১৯৫০-এর আগে যারা ভারতে এসেছেন শুধুমাত্র তারাই এদেশের নাগরিক গণ্য হবেন। এই হিসাবে ১৯৫১ সালের জনসগণনার পর এই নাগরিকত্বের তালিকা তৈরি হয়।

১৯৭০-এর দশকে নাগা, মিজো, কুকি প্রভৃতি জাতি ও জাতিসত্ত্বাগুলির স্বাধীনতার দাবিতে লড়াই এর পাশাপাশি অসমেও কয়েকটি অসমীয়া সংগঠন স্বাধীন অসম-এর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এদিকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার যুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু বাঙালি অসমে আশ্রয় নিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধীর হস্তক্ষেপে অসম ছাত্র ইউনিয়নের সাথে রাজীব গাঁধীর সরকারের চুক্তি হয় (১৯৮৫)। এই চুক্তিতে বলা হয় ১৯৭১ পর্যন্ত যারা পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে এসেছেন শুধুমাত্র তাদেরই দেশের নাগরিক মানা হবে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী সাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী নতুন করে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি তৈরির কাজ শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টের তদারকিতে। যার চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করেছে বর্তমান ভারত সরকার।

সুপ্রিম কোর্ট আশ্বাস দিয়েছে যে যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা আবার প্রমাণপত্র দাখিলের সুযোগ পাবেন। কিন্তু বাদ পড়া নাগরিকরা নতুন প্রমাণপত্র কোথায় পাবেন? আর পেলেও তা কি গ্রাহ্য হবে? না হলে এদের অবস্থা হবে 'দেশহীন মানুষ' (State Less people) এর মতো। দেশের সীমান্ত কি খোলা? তবে তারা কোথায় যাবে?

এই চল্লিশ লক্ষাধিক মানুষের কিন্তু ভোটার কার্ড, আধার কার্ডের মত পরিচয় পত্র আছে। আধার কার্ডে ঘটা করে লেখা থাকে "আমার আধার আমার পরিচয়"। ভারতের নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার কার্ডে লেখা থাকে "নাগরিক পরিচয়পত্র"। এগুলি কি তবে নাগরিকের পরিচয়পত্র নয়? এই ৪০ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁদের জন্ম অসমে বা ভারতের অন্যত্র ১৯৭১ সালের পরে। অনেকেই এমন আছেন যারা বৈবাহিকসূত্রে ১৯৭১-এর পর ভারতীয় হয়েছেন।

১৯৮৫ সালের চুক্তি অনুসারে তৈরি হওয়া জাতীয় নাগরিক পঞ্জিতে এমনটাই যে হওয়ার কথা, একথা তো রাজনীতিবিদদের জানা ছিল, তবুও তারা পরিস্থিতির ফায়দা তুলতে বাজার গরম করছেন।

এমন 'দেশহীন মানুষ' এখন পৃথিবীর সর্বত্র। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকোর অভিভাষীরা। কাজের খোঁজে এবং যুদ্ধ বা দাঙ্গায় মানুষ সীমানা অতিক্রম করে যেতে বাধ্য হয় চিরকালই। একসময় শাসকরাই শ্রমের প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশ থেকে লোক ধরে আনত বলপূর্বক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কানাডা, ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এমনকি ভারতের কয়লা খনি, চা-বাগিচায় অন্যত্র থেকে লোক আনা হয়েছে। এখন পুঁজিবাদের অতি উৎপাদনের যুগে কাজের তুলনায় শ্রমদানকারী জনসংখ্যা বেশি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই শুরু হয়েছে 'বিদেশী তাড়াও অভিযান' বেকারত্বের হিসাবকে সামনে রেখে এই অভিযান চলছে প্রায় সর্বত্র। পশ্চিমবঙ্গের আমরা বাঙালি বহুকাল ধরে বিহারী তথা অবাঙালিদের খেদানোর আওয়াজ দিয়ে যাচ্ছে। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এমন উদাহরণ আছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রতিবিপ্লবী গৃহযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ ইত্যাদির ফলে দেশ ছেড়ে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ বিদেশে আশ্রয় নিচ্ছেন বাস্তুহারা হিসেবে। ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, মিশর, মায়ানমার, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই 'দেশহীন মানুষ' বা বাস্তুহারা মানুষ এখন ব্যবস্থার নিয়ম হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘ তাই ইউএন রিফিউজি এজেন্সি (UNHCR) গঠন করেছে।

বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ এই পরিস্থিতিকে কোন দৃষ্টিতে বিচার করবেন? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক, দেশের সীমানা মানে না। পুঁজিবাদী বিশ্বে পুঁজিও এখন আন্তর্জাতিক। তার অবাধ গতিবিধির নিয়ম তৈরি হয়েছে। সমস্ত দেশের মধ্যে অবাধ পণ্য সঞ্চালনের নীতিও গৃহীত হয়েছে। তবে কি শুধু মানুষের বেলাই সীমানা আর কাঁটাতার?

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন বাস্তুহারা মানুষ অন্য দেশে গেলে সেই দেশের সম্পদের উপর ভাগ বসায়। ফলে চাকরি ও সম্পদে অভাব তৈরি হয়। তাই তাদের দেশছাড়া করা কর্তব্য। যারা এসব বলেন তাদের পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, মানুষের শরীরে কি শুধুই খাওয়ার জন্য মুখ এবং পাকস্থলী-ই আছে? তার হাত-পা, পেশী এবং মস্তিষ্ক নাই? সে কি অন্য দেশে গিয়ে শুধুই খায় আর সম্পদ ধ্বংস করে? শ্রমের মাধ্যমে বস্তুমূল্য সৃষ্টি করে না? অবশ্যই করে, নিজের প্রয়োজনের বহু অতিরিক্তই করে। এই চল্লিশ লক্ষাধিক মানুষের অধিকাংশই শ্রমজীবী মানুষ। তারা শ্রমদান করে নিজের প্রয়োজনের বহু অতিরিক্ত বস্তুমূল্য সৃষ্টি করে এসেছেন এতদিন। মালিকশ্রেণী তাদের শ্রমদ্বারা সৃষ্ট বস্তুমূল্যের অতি সামান্য অংশই তাদের দিয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন এই 'বিদেশী নাগরিকরা' দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। রোহিঙ্গা সমস্যা তাই দেখাচ্ছে। এদের প্রচারের বিরুদ্ধে বলা যায় নিজেদের বাঁচবার অধিকারের জন্য লড়াই কি অন্যায়, না অনৈতিক? এই নাগরিকদের পরিচয়হীন দেশহীন করে দিলে, অন্য দেশ তাদের না নিলে তারা যদি আত্মরক্ষার চেষ্টা করে বা পরিস্থিতি সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যদি তাদের ব্যবহার করে তবে তার দায় কার? বাস্তুহারা শ্রমজীবী মানুষ, না রাষ্ট্রের মালিকশ্রেণী?

প্রশ্ন ওঠে ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বর্ণের মানুষ কোন দেশে বা অঞ্চলে বাসস্থান গড়লে সেখানকার মূলনিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, সাংস্কৃতিক অধিকার হরণ, কর্মের অধিকার হরণ।

এই প্রচারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের বক্তব্য হল – মানুষ জাত, ধর্ম, ভাষা, বর্ণে বিভক্ত নয়। মানুষ শ্রমজীবী আর পরশ্রমজীবী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পরশ্রমজীবী অর্থাৎ আধুনিক পুঁজিপতিশ্রেণী ধর্ম-জাতি-ভাষা-বর্ণ-সম্প্রদায় ইত্যাদির নামে শ্রমজীবীশ্রেণীর মধ্যে সমস্যা টিঁকিয়ে রাখে। পুঁজিবাদ যতদিন টিঁকে থাকবে এই সমস্যাও ততদিন টিঁকে থাকবে এবং প্রতিনিয়ত বাড়বে। পুঁজিবাদের অবসানের সাথেই এই সমস্যার অবসান সম্ভব। দুনিয়া জুড়ে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান একদিন দেশের সীমানার বিলোপ ঘটিয়ে মানবজাতির মুক্তি আনবে।■

● ৭ *পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ*

মাদার টেরিজা'র মিশনারিস অফ চ্যারিটির স্বরূপ উন্মোচিত

শিশু বিক্রি হয়েছে। হোমের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

দত্তক আইন সংশোধন হওয়ার পর আইনীভাবে তিন বছর ধরে দত্তক দেওয়া বন্ধ করেছে মিশনারিস অফ চ্যারিটি। কিন্তু অবৈধভাবে শিশু বিক্রি যে বন্ধ হয়নি, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

এদিকে 'নির্মল হৃদয়' এর হৃদয় যে নির্মল নয়, তা ফাঁস হয়ে পড়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ১২ই জুলাই টুইট বার্তায় লেখেন – মাদারের নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করার জন্য আমি দুঃখিত, এটা বি জে পি-র চক্রান্ত।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে সি পি আই এম এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন "মাদার টেরিজার এই প্রতিষ্ঠান খুবই সম্মানীয়। আমাদের মতভেদ থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা সর্বোচ্চ সম্মান দিই। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অবিশ্বাস্য।"

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর দ্বারা 'নির্মল হৃদয়'এর প্রশংসার প্রতিবাদে লেখিকা তসলিমা নাসরিন টুইটারে লিখেছেন "মাদার টেরিজা চ্যারিটি হোম শিশু বিক্রি করে এটা কোনো নতুন খবর নয়। মাদার টেরিজা নানাবিধ অবৈধ, অমানবিক, অনৈতিক, নীতিহীন, বদকাজে যুক্ত ছিলেন। শুধু বিখ্যাত বলে এমন দুস্কৃতিদের রক্ষা করার চেষ্টা করবেন না।" ■

সমাজ দর্পণ ঃ

দিল্লী, মেখলিগঞ্জ, ঝালদা ... এই অনাহারে মৃত্যু মিছিলের শেষ কোথায় ?

গত জুলাই মাসের ২৭ তারিখ সংবাদে প্রকাশ – পূর্ব দিল্লীর মান্ডওয়ালি বস্তীতে একটানা কয়েক দিন অর্দ্ধাহারে-অনাহারে থাকার পর ৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা, মঙ্গল সিং বিবাহের পর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরে থাকতেন এবং কাজের খোঁজে দিল্লী গেছিলেন সাম্প্রতিককালে। অন্ন সংস্থানের জন্য দিল্লী গেলেও মেলেনি কাজ। তাই স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে তারা প্রায় অনাহারেই ছিল। ২৫শে জুলাই জানা যায় যে মঙ্গল সিং এর ৩টি শিশু অনাহারে মারা গেছে। এই মৃত্যু অনাহার না অপুষ্টি না শারিরীক অন্য অসুখে এই নিয়ে চলে মিডিয়া এবং সংসদীয় পার্টিগুলির কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। ২৭শে জুলাই দ্বিতীয় দফায় ময়না তদন্তের পর জানা যায় যে শিশু ৩টির পাকস্থলীতে একদানাও খাদ্যদ্রব্য ছিল না। অন্ততঃ ৮-৯ দিন তারা অনাহারে ছিল। এই মৃত্যুর জন্য কেন্দ্র সরকার না দিল্লীর রাজ্যসরকার নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দায়ী এই নিয়ে চলে চাপান উতোর।

এই মৃত্যু নিয়ে সোরগোল থামার আগেই গত ২৮ এবং ২৯শে জুলাই এই রাজ্যের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের দাসপাড়ার বাসিন্দা বিজয় বর্মণের ২ মেয়ে সুস্মিতা ও রূপালি বর্মণ অনাহারে মারা যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। তখন একই কারণে সুস্মিতা-রূপালি'র অন্য দুই ছোট বোন সোনালি ও কৃষ্ণা এবং ভাই শুভজিৎ হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। এই সংবাদ পেয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধিরা মেখলিগঞ্জে যান গত ৪ঠা অগাস্ট।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে খোঁজ করে জানা যায় ওইদিন দুপুরের পর বিজয়বাবুর জীবিত ৩ সন্তানকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। এই খবর জেনে সরাসরি বিজয় বাবুর বাড়ি যাওয়া হয়। ছোট্ট শহরের দক্ষিণপ্রান্তে ৯ নং ওয়ার্ডে পৌঁছাতেই এলাকার দারিদ্রের ছবি লক্ষ্য করা যায়। বিজয় বাবু-র বাড়ি, মানে সরকারি জমিতে গড়া একটা ঝুপড়ি ঘর। বিজয়বাবু জানান আজ বাকিদের ছুটি হয়েছে। কিন্তু বাচ্চাদের কোথায় রাখবেন কি খাওয়াবেন এই ভেবে স্ত্রী ও মা তাদের কাকার বাড়ি নিয়ে গেছেন। কথা বলে জানা গেল বিজয়বাবুদের আগে বাড়ি ছিল কোচবিহারের জামালদহে। ভূমিহীন পরিবারটি কাজের সন্ধানে কিছুদিন আগে মেখলিগঞ্জে চলে আসেন। বিজয় বাবুর বাবা, মা, তিনি এবং তার স্ত্রী দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। অর্দ্ধাহার-অনাহারেই দিন কাটত। ৭ মাস আগে বাবা মারা যাওয়ার পর বিজয়বাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভ্যান চালনাই ছিল তার মুখ্য জীবিকা। শারিরীক কারণে মুখচোরা, নরম স্বভাবের মানুষটি অধিকাংশ দিনই কাজ করতে পারতেন না। সংসারের হাল ক্রমশ করুণ হতে থাকে। অর্দ্ধেক দিন তাদের খাওয়া জুটত না। সাদা রেশন কার্ডে সপ্তাহে কার্ড পিছু ৫০০ গ্রাম করে ৪ কি.গ্রা. চাল মিলত ২ টাকা দরে। এই চালে সপ্তাহে ২ দিনের বেশি চলে না। ছেলে মেয়েরা চরম অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। বড় মেয়ে সুস্মিতাকে হাসপাতালে রক্তশূন্যতার জন্য কয়েক বার রক্তও দেওয়া হয়। প্রতিবেশিদের অবস্থাও এত করুণ যে সাহায্য মেলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঘরে খাবার নেই, চিকিৎসা চালানোও অসম্ভব। বাচ্চারা ইস্কুলে গেলে একবেলা খাবার পেতে পারে, কিন্তু তাদের সেখানে পাঠানোও অসম্ভব হয়ে যায়। যতদিন গেছে ততই তাদের নাড়াচাড়ার ক্ষমতাও কমতে থাকে। এই অবস্থায় রোজগারের শেষ সম্বল ভ্যানটিও বিজয়বাবু বেচে দেন ২৮শে জুলাই সকালে, মেয়েদের চিকিৎসার জন্য। ওইদিন রাতেই বড়মেয়ে সুস্মিতা মারা যায়। বড় মেয়ের শোক সামলাতে না সামলাতে পরদিন ২৯শে জুলাই মেজ মেয়ে রূপালি মারা যায়। এরপর প্রতিবেশিরা ছোট দুই বোন সোনালি ও কৃষ্ণা এবং ভাই শুভজিৎকে হাসপাতালে ভর্তি করায়। ডাক্তার বাবুদের ওরা বলেছে "খুব খিদা পায়। উইঠ্যা বসতেও পারি না।"

পরপর দুই মেয়ের মৃত্যু সারা দেশের সংবাদ শিরোনামে ওঠায় এম এল এ, এম পি, নেতা-মন্ত্রী-আমলারা আসতে শুরু করে বিজয় বাবুর বাড়ি। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ত্রাণ আসতে থাকে। এখন আবার পাশের সরকারি খাস জমিতে ঘর বানিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নেতা-মন্ত্রীদের সামনে পাড়ার শ্রমজীবী মানুষ স্থায়ী কাজের দাবি রেখেছেন।

৯ই অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২নং ব্লকের বামনিয়া বেলডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিমলা পান্ডে (৬৭) অনাহারে মারা গেলেন। তিনি এবং তার ছেলে ছিলেন ভিখারি। কাজ না পেয়ে তারা ভিক্ষা করত। ফলে মাঝে মাঝে অনাহারে দিন কাটত। ৪৭ বছর বয়সী ছেলে অভির বলেন "মা শুধু জল খেয়েই কাটিয়েছেন টানা ৭ দিন। যেদিন ভিক্ষা পাই না সে দিন আমাকেও জল খেয়ে দিন কাটাতে হয়। তাই

আমারও দিন ঘনিয়ে আসছে।”

দিল্লী বা মেখলিগঞ্জে বা ঝালদায় অনাহারে মৃত্যুর খবর কি ব্যতিক্রম? আদৌ নয়। সরকার, সংসদীয় দল এবং মিডিয়ার একাংশ এগুলিকে ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে দেখাতে চাইছে। জি ডি পি-র নিরীখে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত ষষ্ঠ স্থানে উঠে আসার খবর নিয়ে যতই উল্লাস হোক সরকারি তথ্যই বলছে দেশের ১৫.২% মানুষ আজও অপুষ্টিতে ভোগে। দেশের ১৯ কোটি ৪৬ লক্ষ মানুষ আজও খিদা পেটে শুতে যায়। অপুষ্টির কারণে দেশে প্রতিদিন ৩ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটে। আজও দেশে সদ্যজাত শিশুদের কমপক্ষে ৩০% মারা যায়। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৩০.৭% আজও অপুষ্ট এবং বয়স অনুপাতে কম ওজন বিশিষ্ট। অনাহার মুক্তির হিসাব অনুসারে বিশ্বের ১১৯ টি দেশে ভারতের স্থান ১০০।

অথচ দেশে উৎপন্ন এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্য শস্যের প্রায় ৪০% গুদামে পচে নষ্ট হয়। সরকারি হিসেবে দেশের মানুষের খাদ্যের জন্য প্রয়োজন বছরে ২২.৫-২৩ কোটি টন খাদ্যশস্য। ২০১৬-১৭ সালে এদেশের খাদ্য উৎপন্ন হয়েছে ২৭.৩৪ কোটি টন।

সুতরাং খাদ্যের অভাব নয়, দেশের কোণে কোণে যে লক্ষ-কোটি মানুষ অর্দ্ধাহারে-অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে তার কারণ পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী সমাজ চলে মুনাফার লক্ষ্যে, মানুষের অভাব দূর করার লক্ষ্যে নয়। তাই এই সমাজের যত বিকাশ হয় ততই একদিকে বাড়ে মুষ্টিমেয় মানুষের জীবনে প্রাচুর্য আর অসংখ্য মানুষের জীবনে নিঃস্বতা।

‘গরিবী হঠাও’, ‘আচ্ছে দিন’, ‘উন্নয়ণের জোয়ার’ স্লোগানগুলির এই হল বাস্তব চিত্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অনাহারে মৃত্যুর তথ্য কখনও স্বীকার করতে চায় না। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে ‘Final Cause of death’ বা মৃত্যুর সর্বশেষ কারণ হিসাবে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হার্ট ফেল ইত্যাদি লিখতে ডাক্তাররা বাধ্য হন। তবুও কি ‘আচ্ছে দিন’, ‘উন্নয়ণের জোয়ার’ ... এর ঢাক পিটিয়ে অনাহার-অপুষ্টিতে মৃত্যুর খবর চেপে যাওয়া যাচ্ছে? না, তাই দান-ধ্যান-স্বেচ্ছাসেবার নামে মলম লাগিয়ে ক্ষতস্থান কিছুদিন ঢেকে রাখার প্রয়াস চলছে। কারণ শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজে এর কোন সমাধান নেই। শোষণমূলক সমাজের অবসানের লক্ষ্যে জেগে উঠতে হবে অনাহার ক্লিষ্ট শ্রমজীবী জনতাকে। ■

দুঃসাহসিক অভিযানে গুহার নিচে আটকে থাকা ফুটবল দল উদ্ধার

গত ২৩শে জুন সকালের অনুশীলন সেরে উত্তর থাইল্যান্ডের ওয়াইল্ড বোরস নামক একটি স্থানীয় ফুটবল টীম সাইকেলে চেপে থাম লুয়াঙ নাং নন গুহার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন প্রবল বৃষ্টি চলছিল, বৃষ্টিতে গুহার অবস্থা কি এই নিয়ে তারা কৌতূহল প্রকাশ করে ভিতরে ঢোকে। এই টীমের ১২ জন ফুটবলারই বালক এবং তাদের কোচ মাত্র ২৫ বছর বয়সী। প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বানের জলের স্রোতে ঐ ১৩ জন গুহার গভীরে প্রবেশ করে। গুহাটি গভীরতা হল প্রায় আড়াই মাইল।

ফুটবল টীমকে উদ্ধারের জন্য থাইল্যান্ডের নৌবাহিনী ২৫শে জুন থেকে অভিযান শুরু করে। প্রথমে শুরু হয় গুহা থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তোলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক দল, ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞ ডুবুরিরা উদ্ধারের কাজে নামে। ২৭শে জুন থেকে বিশ্বের সেরা ৯০ জন বিশেষজ্ঞ ডুবুরিরা অভিযানে নামে। ২রা জুলাই ২ জন ব্রিটিশ ডুবুরি গুহার পাথর ভেঙে ও সরিয়ে গুহার মুখ বড় করে অক্সিজেন ট্যাঙ্কসহ আড়াই মাইল নিচে পৌঁছায়। ডুবুরিরা ওই ১৩ জনকে খাবার ওষুধপত্র দেয় এবং এয়ার টিউবের সাহায্যে শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য অক্সিজেন দেয়। ৪ঠা জুলাই থেকে ওদের গুহা থেকে বাইরে আনার অভিযান শুরু হয়। তখনও গুহার বেশিরভাগ অংশ জলমগ্ন। প্রচন্ড কাদাগোলা জলের মধ্যে দুর্বল শরীরে অতি সরু পথে সাঁতারের অভিজ্ঞতা না থাকায় কাজটি দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন বিশেষজ্ঞরা ওদের মনোবল বাড়াবার এবং কঠিন পথ অতিক্রম করার ট্রেনিং দিতে থাকে। ওপর থেকে খাবার, ওষুধ, অক্সিজেন আসতে থাকে। সেনাবাহিনীর সৈনিকরা এবং ডাক্তাররা তাদের শেখায় কিভাবে ডাইভিং মাস্ক পরে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার যন্ত্রপাতি নিয়ে এগুতে হবে। ৮-১০ই জুন ডুবুরিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রথমে ৪ জন, তারপর ৪ জন এবং সর্বশেষে বাকি ৫ জনকে ঐ গুহা থেকে উদ্ধার করে।

এই দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্য দেখে সমগ্র বিশ্বের জনতা ব্যাপক উল্লাস প্রকাশ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে অভিনন্দন বার্তা আসতে থাকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সফল আন্তর্জাতিক প্রয়োগ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অদম্য মনোভাবই পারল এই দুঃসাহসিক অভিযানকে সফল করতে। অথচ এত কিছুর পরও থাই বাহিনীর প্রধান নোপারাৎ খানথাঙ অভিযান শেষে মন্তব্য করেন “আমরা নিশ্চিত নই যে এই ঘটনা অলৌকিক না বিজ্ঞানের জয় না অন্য কিছু।” ■

তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন
বে-আইনী তামা কারখানা বন্ধের দাবিতে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশের গুলিতে ১২ জন নিহত

ব্রিটেন ভিত্তিক গ্লোবাল কোম্পানির বেদান্ত গ্রুপ প্রায় ২০ বছর আগে তামিলনাড়ু রাজ্যের সমুদ্র উপকূলের তুতিকোরিনে তামা তৈরির কারখানা স্থাপন করে। এই কারখানা স্থাপনার ক্ষেত্রে গুজরাট সহ বহু রাজ্য আপত্তি করলেও তামিলনাড়ু সরকার কারখানা গড়ার জমি দেয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর শর্তে।

কিন্তু উৎপাদন শুরু হতেই দেখা যায় চতুর্দিক দূষিত হচ্ছে, সমুদ্রের মাছ মারা যাচ্ছে। আশপাশের মানুষের ক্যানসারসহ নানা দুরারোগ্য রোগ হচ্ছে। তখন কিছু পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃত্বে সরকারের কাছে কারখানা বন্ধের আর্জি পেশ করা হয়। সরকার গুরুত্ব দেয়নি। এরপর কারখানার পাইপ ফেটে যখন দূষণের মাত্রা ব্যাপক হয় রাজ্য সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে লাইসেন্স খারিজের আবেদন করে। বোর্ড আর্জি খারিজ করায় সরকার যায় সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট ১০০ কোটি টাকা জরিমানা করলেও চূড়ান্ত রায় স্থগিত রাখে।

মার্চ ২০১৮-তে বেদান্ত গ্রুপ তার স্টারলাইট কারখানা সম্প্রসারণের জন্য বোর্ডের কাছে অনুমতি চায়। কিন্তু বোর্ডের অনুমতির তোয়াক্কা না করে নতুন ইউনিট নির্মাণ শুরু করে দেয়। এই অবস্থায় জনসাধারণ কারখানা বন্ধের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। ২২শে মে কারখানা ঘেরাও করে প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশনের ঘোষণা হয়। ঘেরাও শুরু হওয়ার আগেই চতুর্দিকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ২ হাজার সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়। অগত্যা জনতা ১৪৪ ধারা অমান্য করে ব্যারিকেড ভেঙে কারখানা গেটে হাজির হয়। পুলিশ লাঠি চার্জ শুরু করে। জনতা প্রশাসনের দপ্তরের দিকে এগুতে চাইলে খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। নিরস্ত্র জনতার উপর সশস্ত্র পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই একজন মহিলাসহ ১০ জনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে আরও ২ জন মারা যায়। গুরুতর আহত হন ৫০ জনের বেশি।

কোম্পানি আধিকারিক ঘটনার জন্য ছদ্ম দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ২৪শে মে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও রাজ্য সরকার কারখানা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে বেদান্ত গ্রুপ গেছে উচ্চ আদালতে। ■

মাদার টেরিজা'র মিশনারিস অফ চ্যারিটির স্বরূপ উন্মোচিত

ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী মাদার টেরিজা ভারতে মিশনারিস অফ চ্যারিটি তথা নির্মল হৃদয় নামের হোম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'মানবসেবায় অগ্রগণ্য' হিসাবে শতাব্দির শেষার্ধে মাদার টেরিজাকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর ক্যাথলিক ধর্মগুরুর প্রধান পোপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে সেন্ট সম্মানে বিভূষিত করেছিলেন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার স্বরূপ সমীক্ষণের মার্চ ২০১৬ সংখ্যায় (উপাধি প্রদানের আগে) উন্মোচন করা হয়। কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের অন্যান্য সেন্টদের মতই মাদার টেরিজার মৃত্যুর পরও সশরীরে দেখা দিয়ে রোগীর রোগ সারাতে পারেন!

কিন্তু মাদার'র প্রতিষ্ঠিত হোম সম্পর্কে তাঁর জীবিতকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু অমানবিক, নীতিহীন কাজের অভিযোগ উঠে এসেছে, যদিও উক্ত প্রতিষ্ঠান তা স্বীকার করেনি।

গত ৫ই জুলাই এর খবর – উত্তর প্রদেশের শোনভদ্রের বাসিন্দা এক নিঃসন্তান দম্পতি শিশু দত্তক নেওয়ার জন্য মিশনারিস অফ চ্যারিটি পরিচালিত রাঁচির 'নির্মল হৃদয় হোমে আসেন। ঐ হোমে মূলত অবিবাহিত মায়েদের রাখা হয়। অভিযোগ গত ১৪ই মে ২০১৮, ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় ১৪ দিনের একটি পুত্রসন্তানকে ঐ দম্পতির হাতে তুলে দেয় হোমের সিস্টার ইনচার্জ অণিমা ইন্দওয়ার। ১লা জুলাই ঐ দম্পতিকে শিশুসহ আবার হোমে ডেকে পাঠান হয় দত্তক নেওয়ার পর কিছু কাগজপত্র দেওয়া বাকী আছে বলে। এ বিষয় অণিমা লিখিতভাবে দম্পতিকে জানিয়েছিল। দম্পতির অভিযোগ হোমে আসার পর তাদের কাছ থেকে শিশুপুত্রকে কেড়ে নেয় অণিমা। ঘটনার পর রাঁচির কোতোয়ালি থানায় শিশু বিক্রির অভিযোগ দায়ের করেন রূপা বর্মা। ঐ দম্পতি অভিযোগ করেন যে হোমে অণিমার নেতৃত্বে রমরমিয়ে শিশু বিক্রি চলছে। অভিযোগ পেয়ে শিশু রক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা ঐ হোম পরিদর্শন করেন। পুলিশী তদন্তে জানা যায় ঐ হোম থেকে আগেও বহু

●*শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়*

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

সূর্যকে ছুঁতে রওনা হল নাসার মহাকাশযান পার্কার সোলার প্রোব

১২ই অগাস্ট স্থানীয় সময় ভোর রাতে (৩.৩১ মিনিট) এবং আন্তর্জাতিক সময় সকাল ৭টা ৩১ মিনিট (ভারতীয় সময় দুপুর ১টা ১ মিনিট)-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী 'ডেল্টা ফোর হেভি রকেট' এর কাঁধে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিল সূর্যমুখী মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব'। আগের দিন ১১ই অগাস্টই অভিযানের কথা ছিল কিন্তু প্রযুক্তিগত সামান্য ত্রুটি নজরে আসায় – শেষ মুহূর্তে গ্যাসীয় হিলিয়াম অ্যালার্ম বেজে ওঠায় অভিযান পিছিয়ে দেওয়া হয়। '১৫০ কোটি মার্কিন ডলার খরচ সাপেক্ষ এই অভিযানের বিষয় ইঞ্জিনিয়াররা অত্যন্ত সাবধান' – একথা বলেন এই মিশনের অধিকর্তা থমাস জারবুচেন। তিনি এই অভিযানকে নাসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

এখন প্রশ্ন হল কোন পথে সূর্যের দেশে পৌঁছাবে এই মহাকাশযান? পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে করতে পার্কার সোলার প্রোব শুক্র গ্রহের কক্ষপথে পৌঁছাবে দেড় মাস পর অক্টোবর মাসে। তারপর অনেক অনেক পথ পার করে তাকে সূর্যমুলুকে পৌঁছাতে হবে। ২০২০ সালে অগাস্ট মাস নাগাদ প্রথম সৌর মুলুকে পৌঁছাবে পার্কার প্রোব। তারপর তা আরও এগিয়ে সূর্যের বায়ুমন্ডলের একেবারে বাইরের স্তর করোনায় ঢুকে পড়বে ২০২২ সালের মাঝামাঝি।

সূর্যের বায়ুমন্ডলে ঢুকে পড়ার প্রায় ৭ বছর ধরে বিভিন্ন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে নাসা'র এই মহাকাশযান। এই প্রদক্ষিণের সময় কখনও তা সূর্যের কাছে আসবে আবার কখনও কিছুটা দূরে চলে যাবে। পার্কার প্রোব যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে পৌঁছাবে তখন সূর্যের পিঠ বা সারফেস থেকে তার দূরত্ব হবে মাত্র ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল বা ৬১.৬ লক্ষ কি. মি.। এই সময় প্রোবের গতিবেগ হবে সর্বাধিক, ঘণ্টায় ৪ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল। এই অবস্থায় পার্কার প্রোবই হবে মানুষসৃষ্ট সর্বাধিক গতিশীল বস্তু।

প্রোজেক্টের বিজ্ঞানী নিকোলা ফক্স মন্তব্য করেন "সূর্যের করোনাকে মহাকাশযান দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে আজ অবধি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়।" "আমরা সবশেষে সেইসব প্রশ্নের উত্তর পাব যে প্রশ্নগুলি সৌরবিজ্ঞানী ইউজিন নিউম্যান পার্কার ১৯৫৮ সালে তুলেছিলেন তার তাত্ত্বিক গবেষণায় – করোনা এবং সৌর ঝড় প্রসঙ্গে। এখন তাঁর নামে নামাঙ্কিত মহাকাশযান সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে মহাকাশে। আমি উৎসাহে ধৈর্যহীন হয়ে পড়ছি কি কি আবিষ্কার হতে চলেছে তাই ভেবে! বিজ্ঞানের গবেষণায় এই অভিযানের তাৎপর্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

নাসার তরফে জানানো হয়েছে, সৌর বায়ু, সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্র, চৌম্বক ঝড়ের কারণ আর তাদের আচার-আচরণ জানতে বুঝতে সৌরবিজ্ঞানী ইউজিন পার্কার যে গবেষণাগুলি করেছেন তার ভিত্তিতে বর্তমানেরটি সহ মোট ৩৫টি অভিযান করেছে নাসা। পার্কারই প্রথম কোন বিজ্ঞানী জীবিত অবস্থায় যাঁর নামে কোনও মহাকাশযানের নামকরণ করল নাসা।

এখন প্রশ্ন হল সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে মহাকাশযানটি গলে নষ্ট হয়ে যাবে না তো? নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে প্রায় ৪.৫ ইঞ্চি (১১.৪৩ সে.মি) পুরু অতি ক্ষমতাশালী তাপরোধক (Shield) লাগানো হয়েছে সোলার প্রোবের গায়ে। তাই সূর্য থেকে মাত্র ৬১.৬ লক্ষ কি.মি দূরে পৌঁছেও তা উত্তাপে নষ্ট হবে না কারণ এই তাপরোধক পৃথিবীতে সূর্য যে পরিমাণ সৌররশ্মি বিকিরণ হয় তার ৫০০ গুণেরও বেশি বিকিরণ সহ্য করতে পারবে। যেখানে সূর্যের উষ্ণতা ১০ লক্ষ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছাবে সেখানেও এই তাপরোধক (Shield) মাত্র ২৫০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১৩৭১ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণ হবে।

নাসার বিজ্ঞানীরা আরও জানান যে মহাকাশযানের ভিতরের তাপমাত্রা সমস্ত প্রযুক্তি সঠিকভাবে কাজ করলে হবে মাত্র ৮৫° ফারেনহাইট (বা ২৯.৮° সেলসিয়াস)।

পার্কার মহাকাশযান সূর্যের বায়ুমন্ডলের একেবারে বাইরের স্তর বা করোনায় যখন পৌঁছাবে তখন সূর্যের করোনার তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ সূর্যের পিঠের তাপমাত্রা মাত্র ৬ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে করোনার তাপমাত্রা সর্বত্র সমান নয়। তা কমে বাড়ে। করোনায় রয়েছে প্লাজমা, যা ইলেট্রন আর প্রোটন কণিকায় ভরা। আর ওই কণাগুলির ছোটাছুটির ফলে সোলার উইন্ড বা সৌর বায়ুর জন্ম হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইউজিন পার্কারই প্রথম সেই সৌরবায়ুর কথা বলেছিলেন তাঁর তাত্ত্বিক গবেষণায়। সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা শক্তিশালী কণা ওর চৌম্বকক্ষেত্রগুলিকে নিয়ে সৌর বায়ু বেরিয়ে আসে সূর্যের থেকে। তা ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সৌরমন্ডলের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। পৃথিবীর দিকেও তা ধেয়ে আসে। সাধারণত এর গতিবেগ সেকেন্ডে ৫০০ কি.মি। তবে নাসার মতে তা ১৮ লক্ষ মাইল অবধি হতে পারে।

সৌরবায়ু থেকে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে? বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের অধ্যাপক দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন স্পেস সায়েন্সের অধ্যাপক দিব্যেন্দু নন্দী জানান – সৌরবায়ুর মধ্যে থাকা চৌম্বকক্ষেত্র ও শক্তিশালী কণাদের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জি পি এস (গ্লোবাল পোজিশনিং সিস্টেম) নেটওয়ার্ডে বড় ধরণের গোলযোগ হতে পারে। আর এই সৌরবায়ুর সাথে সৌর চৌম্বক ঝড় যদি হাত মেলায় তবে তা বিশ্বের সমস্ত পাওয়ার গ্রিড তো নষ্ট করে দেবেই, নষ্ট করে দিতে পারে বিভিন্ন কক্ষপথে থাকা অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটকেও।

অধ্যাপক দীপঙ্কর বন্দোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক দিব্যেন্দু নন্দী সংবাদ মাধ্যমে আরও জানান "এই মহাকাশযানের দৌলতে সভ্যতা এই প্রথম সূর্যের এত কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছে বলে এই প্রথম অনেক নিখুঁতভাবে মাপা সম্ভব হবে সৌরবায়ুর মধ্যে থাকা চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি, ঘনত্ব ও শক্তিশালী কণাদের গতিবেগ।"

অধ্যাপক নন্দী আরও বলেন "তাপগতি বিজ্ঞানের যাবতীয় নিয়ম উপেক্ষা করে কেন সূর্যের পিঠের (যার তাপমাত্রা বড়জোর ৬ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস) চেয়ে পিঠ থেকে বহু দূরে থাকা সূর্যের করোনার তাপমাত্রা এত বেশি (১০ লক্ষ বা তার বেশি ডিগ্রি সেলসিয়াস) তা জানা যাবে। জানা যাবে কেমনভাবে জন্ম হয় সৌরঝড়ের এবং কিভাবে সূর্যের বায়ুমন্ডলের একেবারে বাইরের স্তর (করোনা) থেকে বেরিয়ে আসে সৌরবায়ু।" ■

ভারতে প্রযুক্তিকে দর দেওয়া হয়, বিজ্ঞানকে করা হয় অবহেলা

– বিজ্ঞানী সি এন আর রাও

গত ২১শে মার্চ ২০১৮, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ভারতরত্নে ভূষিত বিজ্ঞানী সি এন আর রাও বলেন "ইউরোপ, আমেরিকা তো দূরের কথা, এশিয়ায় আমাদের পাশের দেশ চীন কিংবা পাশের দেশ কোরিয়া যে হারে উন্নতি করেছে সেখানে আমরা কোথায়?"

এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠানের ভাষণে অধ্যাপক রাও বলেন "ভারতের যেখানেই যাই, সেখানেই দেখি প্রবল কৌতূহলী এবং জ্ঞানপিপাসু শিশুদের। আমার অনুমান ওদের সংখ্যা হবে এক কোটি। কাল কিন্তু ওরা চাকরি চাইবে, গবেষনায় নামতে চাইবে। দেশের প্রশাসন এই সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেছেন বলে তো আমার মনে হয় না।"

অনুষ্ঠানের ভাষণে অধ্যাপক রাও সখেদে মন্তব্য করেন – "ব্যাধিগ্রস্তের মতো ভারতের সমাজ আজ মূল্য দেয় প্রযুক্তিকে, অথচ অবজ্ঞা করে বিজ্ঞানকে। অথচ জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কিংবা সি. ভি রমন কিংবা শ্রীনিবাস রাজানুজনেরা যা নিয়ে ভাবতেন তা হল মৌলবিজ্ঞান।"

"আমার গুরু নোবেলজয়ী স্যর নেভিল মট জগদীশ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষটা এত কিছু করলেন কী করে আমাকে বলতে পার?"

সভায় উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক রাও বলেন, আচ্ছা বল তো পরমাণু ইলেক্ট্রন কণা কবে আবিস্কৃত হয়েছিল? পরে নিজেই উত্তরে বলেন "১৮৯৭-তে। অথচ জগদীশচন্দ্রের যুগান্ত কারী বেতার তরঙ্গ সংক্রান্ত আবিষ্কার ১৮৯৪-এ। ভাবা যায়?" ছাত্রদের তিনি বলেন "স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পেয়ো না।" উদাহরণ দিয়ে বলেন "সেটা ছিল একটা সায়েন্স কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন জওহরলাল নেহরু। তাঁকে থামিয়ে প্রথম সারিতে বসা সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি বাজে বকছেন। বিজ্ঞানীর এমন সাহস চাই।"

রাও আরও বলেন "আমার মনে পড়ছে এক অধিবেশনে আমাকে ডেকেছিলেন সি. ভি রমন। আমায় বলেছিলেন। আমার বয়স ৮২। এখনও ভারতকে বিজ্ঞানে উন্নত দেখে যেতে পারলাম না।" ■

এই প্রথম মহাকাশে নতুন গ্রহ'র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করলেন বিজ্ঞানীরা

জার্মানীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি'র বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলেন। মহাকাশে পৃথিবী থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে একটি বামন তারা (White dwarf star)-কে প্রদক্ষিণরত একটি গ্যাসীয় গ্রহ, (যা এখনও সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় রয়েছে) যার নাম বিজ্ঞানীরা রেখেছেন PDS70b কে ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ SPHERE যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে অঙ্ক কষে বিজ্ঞানীরা এতদিন বহু তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। PDS70b-র জন্মকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে বিজ্ঞানীদের এই সম্বন্ধে জ্ঞান আরও প্রসারিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই PDS70b গ্যাসীয় গ্রহটির ভর আমাদের সৌরমন্ডলীর বৃহস্পতির ভরের প্রায় কয়েকগুণ এবং গ্রহটি তার কেন্দ্রে অবস্থিত বামন তারাটি থেকে প্রায় ৩০০ কোটি কি.মি দূরে অবস্থিত।

PDS70b গ্রহের জন্মরহস্য প্রত্যক্ষ করার ঘটনা, মহাজাগতিক বস্তুগুলির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে সুদূর অতীত থেকে চলে আসা অন্ধবিশ্বাসগুলিকে, অলৌকিক কাহিনীকে খন্ডন করতে আগামী দিনে বড় ভূমিকা নেবে। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কাছে তাই তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ■

মশাকে বন্ধ্যা করে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া নির্মূল করার গবেষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস এ অ্যান্ড এস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবারুণ ঘোষ দাবি করেছেন "ডেঙ্গুর বাহক **'এডিস ইজিপ্টাই'** প্রজাতির বন্ধ্যাত্বকরণ সম্ভব। এই পদ্ধতিতে খুব সহজেই ধীরে ধীরে এই মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা যাবে। একইভাবে ম্যালেরিয়া এবং অন্য মশাবাহিত রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচবে মানুষ।"

গত ৩ বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ায় গবেষণা চালিয়ে অধ্যাপক নবারুণ ঘোষ দাবি করেছেন "এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির পুরুষ মশার ওপর ওলবাচিয়া (wolbachia) ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটিয়ে পরীক্ষাগারে দেখা গেছে যে এই পুরুষ মশার সাথে মিলনের ফলে স্ত্রী এডিস ইজিপ্টাই মশা একেবারে বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।" অধ্যাপক ঘোষ দাবি করেছেন "ব্রাজিলে জিকা ভাইরাসের প্রকোপ যখন মহামারির চেহারা নেয় তখন জিকার বাহক মশা **এডিস অ্যালবোপিকটাস**'র বংশবৃদ্ধি রুখতে গবেষণা শুরু হয়। একইভাবে সাফল্য আসে ব্রাজিলে।"

অস্ট্রেলিয়ার জেমস্ কুক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে সে দেশের জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা CSIRO-র বিজ্ঞানীরা ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস ইজিপ্টাই-এর পুরুষ মশাকে ওলবাচিয়া ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত করেছেন। এর ফলে পুরুষ এডিস ইজিপ্টাই মশা

নির্বীর্জ হয়ে যায়। এরপর এই পুরুষ মশাগুলিকে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড অঞ্চলে (যেখানে ডেঙ্গুর প্রবল প্রকোপ) ছেড়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ৩ মাস ধরে এই পুরুষ এডিস ইজিপ্টাই স্ত্রী এডিস ইজিপ্টাই মশার সাথে যৌন মিলন করে। এর ফলে ঐ স্ত্রী মশকগুলি যে ডিম প্রসব করে তা থেকে মশার লার্ভার জন্ম হয় নি। এই ঘটনায় অস্ট্রেলিয়ার ঐ অঞ্চলে এডিস ইজিপ্টাই মশক শতকরা ৮০% কমে গেছে বলে বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন।

এই প্রক্রিয়া পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে অধ্যাপক নবারুণ ঘোষণ বলেন "ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মশা কীটনাশকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশার বন্ধ্যাত্বকরণে যদি সেই মশার বংশ নির্মূলও হয় তা পরিবেশের ভারসাম্যের কোন ক্ষতি হবে না। মশা থেকে কোন প্রাণীই উপকৃত হয় না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

অধ্যাপক ঘোষের এই দাবি মানতে রাজি নয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গৌতম আদিত্য। তাঁর কথায় "এটাই প্রথম নয়, কয়েক দশক ধরেই এমন পরীক্ষা চলছে। মশার বন্ধ্যাত্বকরণের মাধ্যমে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ আটকানো সম্ভব নয়। কারণ, একটি নির্দিষ্ট জায়গায় হয়তো এডিস ইজিপ্টাই প্রজাতির মশার বন্ধ্যাত্বকরণ সম্ভব। কিন্তু অন্য জাগয়া থেকে যে ফের মশার লার্ভা চলে আসবে না, তা কে বলতে পারে।"

এই গবেষণা প্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসভার মুখ্য পতঙ্গ বিশেষজ্ঞ সংবাদ সংস্থাকে বলেন "বিষয়টি শুনেছি, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় পতঙ্গবাহী রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অনুমোদন দিলে আমরাও তাকে কলকাতায় কার্যকর করার কথা ভাবতে পারি।" ■

ভূমিকম্পের পূর্বাভাসকেন্দ্র গড়া হচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে

ভূবিজ্ঞানীরা সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারত এবং উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সকে ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উত্তরবঙ্গের এবং সংলগ্ন উত্তরপূর্ব ভারতের ভূকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলির মাটির নীচে যে কঠিন ভূত্বক আছে, ভূআলোড়ণের সাথে তার গতিপ্রকৃতি কি হচ্ছে জানার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন যে এই অঞ্চল লিথোস্ফিয়ারিক প্লেট সীমান্তে অবস্থিত। এই প্লেট সীমান্তে প্লেটগুলির নড়াচড়ার (movement) ফলশ্রুতিতেই ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা এবং ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পেতে তাই জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কোচবিহার শহরের সাগরদিঘির পাড়ে আমতলা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলছে। এই কেন্দ্রের জন্য জমি দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। জি এস আই এর আধিকারিক সন্দীপ সোম উত্তরবঙ্গ সংবাদ (১৩/৭/১৮) কে জানান "এক বছরের মধ্যে এই কেন্দ্র তৈরি হয়ে যাবে। মোট খরচ পড়বে ৬০ লক্ষ টাকা।" এই গবেষণার জন্য সুইজারল্যান্ড থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জি পি এস মেশিন এনে বসান হবে। সন্দীপবাবু বলেন "মাটির নীচে যে প্লেট রয়েছে, সেই প্লেটগুলির নড়াচড়া সম্পর্কে আমরা আগে থেকে জানতে পারব। এখান থেকে তিন শো কি. মি পর্যন্ত এই কেন্দ্র কাজ করবে। ২৪ ঘন্টা এই এলাকার মধ্যে থাকা প্লেটের নড়াচড়ার খরচ পাওয়া যাবে। যেখানে প্লেটের ঘর্ষণ হতে পারে বলে খবর আসবে সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে রাখা হবে। কারণ প্লেটের ঘর্ষণ, নড়াচড়ার কারণেই ভূকম্প হয়। সেজন্য আগে থেকে এ বিষয়ে খবর থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি এড়ানো যাবে।"

ভারতের ভূ-বিজ্ঞান সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সারা ভারতের ৩৫টি জায়গায় এইরকম ভূকম্প গবেষণা কেন্দ্র খুলছে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ইতিমধ্যেই আগরতলা, ইটানগর, জম্মু, নাগপুর, কলকাতা, পুণে, ত্রিবান্দাম, জয়পুর, দেরাদুন, চেন্নাই, জবলপুর, আন্দামান এবং সিকিমের মঙ্গন – এই ১৩টি জায়গায় এরকম কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। চন্ডীগড়, পাটনা, ভুবনেশ্বর, রায়পুর, গান্ধিনগর, বিশাখাপত্তনম, কোচবিহার প্রভৃতি আরও ২২টি স্থানে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস করা সম্ভব কি না এই নিয়ে বিতর্ক আজও অব্যাহত। সরকার দীর্ঘদিন এই প্রসঙ্গে উদাসীন। উত্তরবঙ্গে ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন, ভূ-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউশন স্থাপনের দাবি বিজ্ঞান কর্মীরা দীর্ঘদিন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় বিভিন্ন সেমিনারে এই দাবি আমাদের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে ধারাবাহিকভাবে। ভূমিকম্পে আতঙ্কিত মানুষ, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের মানুষ দীর্ঘদিন এই দাবি রেখে আসছেন। কোচবিহার, আগরতলা সহ দেশের ৩৫টি কেন্দ্রে এই গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন কার্যত জনতার আন্দোলনের ফল। ■

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডের ঘোষণা গঙ্গার জল উত্তরপ্রদেশ-বিহার-পশ্চিমবঙ্গের কোথাও বিশুদ্ধ নয়

প্রাচীনকাল থেকে বলা হয়ে আসছে গঙ্গার জল পবিত্র এবং বিশুদ্ধতম। এই পবিত্র জল পান করলে শরীর শুদ্ধ হয়। গঙ্গার জল ছিঁটিয়ে অশুদ্ধ স্থানকে বিশুদ্ধ করা হয়। পূজাপাঠে তাই এই জল ব্যবহার আবশ্যিক। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু ধর্মবাদীরা প্রচার করে আসছেন এই জল কখনও অশুদ্ধ হয় না। কারণ ভগবান শিবের জটা থেকে এই শুদ্ধ জল বেড়িয়ে আসে। তাই গঙ্গা জলের মাহাত্ম হিন্দুধর্মবিশ্বাসীদের কাছে প্রশ্নাতীত। এই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে গঙ্গার জল বোতলে ভরে বাণিজ্য হয়। ২০০ মি. লি এবং ৫০০ মি. লি এর বোতল দেশের ৬৬ টি বড় পোস্ট অফিস যেমন হাওড়া, মেদিনীপুর, তমলুক, শিলিগুড়ি থেকে বিক্রি হয় যথাক্রমে ১৫-২৫ টাকা এবং ২২-৩৫ টাকা দরে। এই বোতলের জল অনলাইনেও বিক্রি হয়। এই জল বিক্রি করে সরকার বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে। পতঞ্জলি'র মত বেসরকারি সংস্থাও গঙ্গাজল নিয়ে ব্যবসায় বিপুল অর্থ উপার্জন করে।

মধ্যপ্রাচ্যের জর্ডন নদীর জল নিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একই ধরণের বিশ্বাস আছে। প্রভু যীশু এই জল পান করেছিলেন বলে

বিশ্বের সর্বত্র খ্রিষ্টানরা এই জলকে পবিত্র মনে করে। চার্চে পাদ্রীরা খ্রিষ্টানদের শুদ্ধ করতে এই জল ব্যবহার করেন। ফলে জর্ডন নদীর জল নিয়েও বিশ্বজুড়ে এমন ব্যবসা চলছে।

বিশ্বের অন্যত্রও একইভাবে ধর্মবাদীদের প্রচারের ফলে বিশ্বাসী মানুষ সরল বিশ্বাসে এরকমভাবে নিজেদের বিশুদ্ধ করতে এমন প্রচারের ফাঁদে পড়েন।

যাইহোক, সম্প্রতি নানা পরিবেশবাদীদের চাপে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ড গত জুলাই মাসে ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনালে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল উত্তরাখন্ড রাজ্যের গোমুখ থেকে এই গঙ্গার শাখানদী (ভাগিরথী এবং তার শেষ অংশ হুগলী)র মোহনা সাগরদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের কোথায় তা পানের এবং স্নানের জন্য বিশুদ্ধ তার ছবি (ম্যাপে চিহ্নিত সবুজ অংশ বিশুদ্ধ এবং লাল অংশ অশুদ্ধ) প্রকাশ করে। এই ম্যাপে দেখা গেছে উৎপত্তিস্থল উত্তরাখণ্ডের কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া এই গঙ্গাজল বাকি সমগ্র অংশেই পান এবং স্নানের পক্ষে বিশুদ্ধ নয়। সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের অংশের কোথাও গঙ্গার জল স্নান বা পানের পক্ষে বিশুদ্ধ নয়। এই বিশুদ্ধতার মাপকাঠি কি রাখা হয়েছে? জল বিশেষজ্ঞ শ্রী মনোজ মিশ্র জানান এই জলে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি মাত্রা, জলের অম্ল-ক্ষার মাত্রা বা পি এইচ এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রাকে এখানে বিচারের মাপকাঠি করা হয়েছে। ১০ মিলি লিটার জলে এই ক্ষতিকারক কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ৫০০ টির কম হলে তাকে ফুটিয়ে পান করলে তা স্বাস্থ্যসম্মত হয়। কিন্তু গঙ্গা নদীর অধিকাংশ অঞ্চলের জলে এই ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা প্রতি ১০ মিলি লিটারে তার ১০ গুণেরও বেশি। জলের অম্ল-ক্ষার মাত্রা বা পি এইচ হওয়া উচিৎ ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পি এইচ মাত্রা এর অনেক কম বলে ক্ষতিকর। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা প্রতি গ্রামে ৬ মিলি গ্রামের বেশি হওয়া প্রয়োজন এবং বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেনের মাত্রা প্রতি লিটারে ২ মিলি গ্রামের কম হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গঙ্গাজলে প্রায় কোথাও এই রাসায়নিক মাত্রা নাই। তাই জাতীয় পরিবেশ আদালতের চেয়ারপার্সন এ কে গোয়েল ঘোষণা করেছেন হরিদ্বার থেকে সাগরদ্বীপ কোথাও গঙ্গার জল স্নান এবং পানের অযোগ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু এই জলে স্নান করেন এবং তা পান করেন এই জল কতটা বিপজ্জনক না জেনে তাই তাদের এ বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। তিনি মন্তব্য করেন সিগারেটের প্যাকেটে যেমন লেখা থাকে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক' তেমনি গঙ্গাজলও যে পান ও স্নানের জন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তা প্রচার করা উচিত!■

আই পি সি সি-র বিশ্ব উষ্ণায়ণ তত্ত্ব আবার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞানী এলিয়ট ক্যাম্পবেল এবং তার সহকর্মীবৃন্দ সম্প্রতি তাদের এক গবেষণাপত্রে জানাচ্ছেন যে তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ পরিবেশের উপর গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে প্রাক্ শিল্প বিপ্লবের যুগের তুলনায় বর্তমান সময়ে উদ্ভিদকূল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩১% বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড শর্করা জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করছে। (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া ০২/০৮/২০১৮)

ঐ বিজ্ঞানীরা এও বলেছেন যে এর ফলে পৃথিবীতে সবুজায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের গ্রহটি বসবাসের উপযুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানী দহনের ফলে বায়ুতে নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই বরং তা সবুজায়ণে সহায়তা করছে। ধরিত্রীকে সুজলা-সুফলা -শস্য-শ্যামলা করছে। যদিও বিজ্ঞানী ক্যাম্পবেল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এই অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড পুরোপুরি শষ্যে পরিণত হবে কিনা বা ঐ শস্যের পুষ্টিগত মান স্বাভাবিক থাকবে কিনা জানা নেই।

যাই হোক, এই গবেষণার ফলাফল বেশ কিছু অসমাধিত প্রশ্নকে পুনরায় বিজ্ঞানীদের সামনে হাজির করেছে এবং তার বৈজ্ঞানিক সমাধান দাবী করছে।

গত শতাব্দীর সাতের দশক থেকেই মনুষ্য জনিত কারণে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং তার ফলস্বরূপ পরিবেশের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সামনে আনা হয়। বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য নিরীহ কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে দায়ী করা হয় এবং বাতাসে ঐ গ্যাস নিঃসরণের জন্য মনুষ্য ক্রিয়াকলাপকে দায়ী করা হয়। রাষ্ট্র সংঘের অধীন সংস্থা IPCC (Inter Governmental Panel on Climate Change) গঠনের পর এই প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দফায় দফায় বসুন্ধরা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তারা পৃথিবীকে 'কাল্পনিক ধ্বংসের' হাত থেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন প্রচার-প্রপাগান্ডা সহ স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকেও এই তত্ত্বগুলি পাঠ্য সূচীর অন্তর্গত করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের পিছনে মহাজাগতিক কারণকে একরকম উপেক্ষা করে গ্রীণ হাউস গ্যাসকে দায়ী করা হয়েছে। জলীয় বাষ্পের গ্রীন হাউস ক্রিয়া অপেক্ষা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়াকে অত্যাধিক হিসাবে দেখানো হয়েছে। আর এর মধ্যে দিয়ে বিশ্বের পুঁজিগোষ্ঠীগুলি কার্বন বাণিজ্য চালাচ্ছে ও বিভিন্ন পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে ব্যবসা চালাচ্ছে। অথচ যে তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র সংঘ তথা IPCC পৃথিবীর 'কাল্পনিক ধ্বংসের' গল্প বলে মানুষকে দোষারোপ করে চলেছে তা বারে বারে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, বিজ্ঞানী মহলের এক বিরাট অংশ এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবী জানিয়ে আসছে। এলিয়ট ক্যাম্পবেল'র সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল প্রমাণ করে যে পরিবেশ কোন স্থবির বস্তু নয়, এটা সদা পরিবর্তনশীল। পরিবেশের উপাদানের যে কোন পরিবর্তনে (প্রাকৃতিক বা মনুষ্যক্রিয়া জনিত) পরিবেশ সাড়া দেয় ও গতিশীল সাম্য রক্ষা করে চলে। IPCC -র বক্তব্য হ'ল পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধিই পেয়ে যাবে অর্থাৎ তা একমুখী। বিজ্ঞানী ক্যাম্পবেল'র গবেষণার ফলাফলের উপর IPCC -র প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবী জানিয়ে আসবে যতদিন না সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। ■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা?

"ও আপনারা বিজ্ঞান সংগঠন করেন? তা খুব ভাল কাজ বটে! গ্রামগঞ্জের মানুষ কি পরিমাণ কুসংকারে ডুবে আছে বলুন তো। এসব কিছুর মূলে অশিক্ষা। ওরা তো অশিক্ষিত, মূর্খ! লেখা-পড়ার গুরুত্বই ওরা জানে না। তা...ই যান, গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ভাল করে ওদের অজ্ঞানতা দূর করুন। এটা অতি পুণ্যের কাজ ...।" শহুরে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এরকম কথাবার্তাই বেশি শোনা যায়। যখন এই সব তথাকথিত শিক্ষিত লোকেদের প্রশ্ন করা হয় "আচ্ছা বলুন তো এখন তো শিক্ষার চল হয়েছে তবুও সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার টিঁকে আছে কেন? কারা এসব টিকিয়ে রাখতে মদত দেয় বলে আপনারা মনে করেন?" তখন লাল-নীল, সবুজ ... রঙের আংটি হাতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলতে শোনা যায় "ইয়ে, মানে ... শিক্ষা আনে চেতনা ... অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষদের শিক্ষিত করলে তবেই ..."। শিক্ষাপ্রাপ্তির বড়াই করা এইসব শহুরে মানুষদের একাংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে – অশিক্ষিত মানুষদের অশিক্ষা, মূর্খতা, সংস্কৃতি এমন কী জিনগত দোষ খুঁজে বার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ জানেন যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলির বহুল প্রচার সত্ত্বেও, তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার অলৌকিকত্ব বিজ্ঞানের আলোকে উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও অলৌকিকবাদ ও কুসংস্কার জনমানসে প্রভাব বিস্তার কেন করে আছে।

এর উত্তর লুকিয়ে আছে প্রথমতঃ পারিবারিক ও সামাজিক প্রথাগত শিক্ষা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে। দ্বিতীয়ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা (বিজ্ঞানের গবেষক, ডাক্তার, সাহিত্যিক প্রভৃতি) অলৌকিকবাদের ও তার কাহিনীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপনকারী প্রচার। তৃতীয়ত রাষ্ট্রের নায়ক, অধিনায়ক ও রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা ধর্ম ও অলৌকিকবাদের পৃষ্ঠপোষকতা। চতুর্থত, সংবাদ মাধ্যম, নানা প্রচার মাধ্যম – ইন্টারনেট, রেডিও, টিভি, যাত্রা, নাট্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা ধর্ম এবং অলৌকিকত্বের মহিমা প্রচার। পঞ্চমত বৈষয়িক জীবনে অনিশ্চয়তা এবং হতাশা।

সমীক্ষণের বিভিন্ন সংখ্যায় এই শিরোনামে অতীতে বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আসুন এই সংখ্যায় সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে রাখা হচ্ছে যাতে এর উত্তর হয়ত মিলবে।

কেরালায় বন্যা

শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকারের দাবির জন্য নাকি ভগবান আয়াপ্পা ক্রুদ্ধ হয়ে বন্যা সৃষ্টি করেছেন!

হ্যাঁ এমনই মন্তব্য করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদ্য নিযুক্ত ডিরেক্টর এস গুরুমূর্তি। আর এস এস-এর ঘনিষ্ট গুরুমূর্তি গত ১৭ই অগাস্ট ২০১৮ টুইটারে লেখেন "শবরীমালায় মহিলারা ঢোকার অধিকার চাইছেন বলে দেবতা আয়াপ্পা চটে যাননি তো!"

কেরালার শবরীমালা মন্দিরে দশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলাদের (যে বয়সে রজঃস্বলা থাকার সম্ভাবনা থাকে) প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা তোলার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। দেশের বরিষ্ঠ আমলা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদ্য নিযুক্ত ডিরেক্টর মন্দিরের এই পবিত্র রীতি অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে তার অবস্থান ঘুরিয়ে জানিয়ে দিলেন এবং জনসাধারণকে জানালেন মন্দিরের প্রাচীন রীতি ভাঙার জন্য তো গোঁ ধরেছ, এখন দেখ কি ঘটল! স্বয়ং ভগবান আয়াপ্পা ক্রুদ্ধ হয়ে কেরালাকে বন্যায় ভাসিয়ে দিল!

এদিকে বিজ্ঞানী মাধব গ্যাডগিল, যিনি পশ্চিম ঘাট পবর্তমালায় বাস্তুতন্ত্রের জন্য যে বিশেষজ্ঞ প্যালেন গঠন করা হয়েছে তার প্রধান। এই বিশেষজ্ঞ দল গঠন করেছে ভারতের পরিবেশ এবং বন দপ্তর ২০১০ সালে। এই কমিটির প্রধান মন্তব্য করেছেন কেরালার ইদুক্কি বাঁধ হল এই অঞ্চলের একটা সমস্যা। অনেক উঁচুতে তৈরি এই বাঁধ সমগ্র পাহাড়ী এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জলধারণ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। এখন এই বাঁধ বাঁচাতে জল ছেড়ে বন্যাকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। শ্রী মাধব গ্যাডগিল কেরালার সাম্প্রতিক বন্যাকে "আংশিকভাবে ম্যানমেড" বা মানবসৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় শিল্প, খনি এবং বাঁধ নির্মাণে বাস্তুতন্ত্রকে বিচার না করা হলে এমন ঘটনাই ঘটবে।

আগাম অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের গাফিলতিতে কেরালায় বন্যায় ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০০ জন মৃত। অসংখ্য মানুষ বিপর্যস্ত। এখন শুরু হয়েছে ত্রাণের রাজনীতি আর ধর্মীয় সুরসুরি।■

“কথা বোলো না, কেউ শব্দ কোরো না, ভগবানের সর্দি হয়েছে গোলযোগ সইতে পারেন না।”

উত্তরপ্রদেশের জৈনপুর। সেখানে জগন্নাথ দেবের এক মন্দির আছে। এবারের রথযাত্রার আগে ২৮শে জুন ২০১৮ পূজারিরা অনুভব করেন ভগবানের স্বাস্থ্য নাকি ঠিক নেই! সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের ডেকে আনা হয়। ‘সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট’ মানব ডাক্তাররা সৃষ্টিকর্তার ‘চিকিৎসা’ শুরু করেন! দফায় দফায় ভগবানকে জোয়ান, গোল মরিচ, তুলসি, লবঙ্গের তৈরি আরক খাওয়াতে থাকেন! আবার ভগবানকে পটলের জুসের পথ্য দেওয়ার নির্দেশ দেন। ওই পটলের জুস অর্থবান ব্যক্তিদের মধ্যে চড়ামূল্যে বিক্রিও হয়। ভগবানের এই ‘চিকিৎসা’কে কিন্তু ভক্তগণের দৃষ্টিগোচর করতে দেওয়া হয় নি। ওই সময় মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ রাখা হয়। মন্দিরের প্রধান আচার্য ডঃ রজনীকান্ত দ্বিবেদী প্রভুর এহেন গুরুতর অসুস্থতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমে

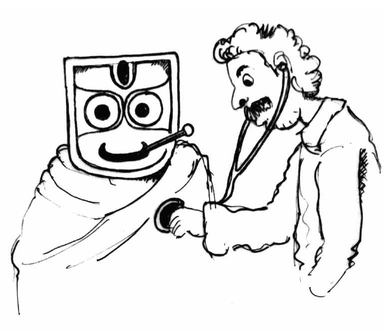

জানান – জুন মাসের প্রচন্ড গরমে মহাপ্রভু জগন্নাথ অসুস্থ বোধ করছিলেন। তখন পুরোহিতরা তাঁর মাথায় ১০০৮ ঘড়া জল ঢালেন। এতে প্রভু ‘সর্দি কাশিতে’ আক্রান্ত হন। এমতাবস্থায় একজন বহুকাল ধরে অসুস্থ ভক্ত প্রভুর কাছে তার রোগ সারাবার জন্য প্রার্থনা করেন। ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রভু তাকে বলেন “কাউকে তো এই অসুখ ভোগ করতেই হবে। নে, আমি তোর সকল রোগব্যাধী গ্রহণ করলাম।” এরপর করুণাময় ভগবান ভক্তের রোগব্যাধী গ্রহণ করে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন!

মানব ডাক্তারদের ‘অক্লান্ত চিকিৎসা’(!)র পর মন্দিরের দরজা রথযাত্রার আগেই খুলে দেওয়া হয়। ‘সুস্থ হয়ে’ ভগবান জগন্নাথ রথযাত্রায় পথে নামেন। ■

(তথ্যসূত্র ঃ হিন্দী পত্রিকা হিন্দুস্থান ১৬.৭.২০১৮)

“লাজে রাঙা হল ব্যাঙি বউ গো মালা বদল হবে ব্যাঙা’র সাথে”

ছত্তারপুর হল মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখন্ড অঞ্চলের একটি গঞ্জ। এটি একটি খরাপ্রবণ এলাকা। এবছরও এখানে তেমন একটা বৃষ্টি হয় নি। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের দুদর্শা থেকে ‘মুক্তি’ দিতে রীতিমতো কার্ড ছাপিয়ে ছত্তারপুর মন্দিরে ধূমধাম করে ব্যাঙা-ব্যাঙি’র বিবাহের আয়োজন করেন মধ্যপ্রদেশের নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী ললিতা যাদব। উৎসবের দিন ছত্তারপুর মন্দির চত্তরে শত শত মানুষের ভিড় লেগে যায়। কী হচ্ছে এখানে? তা জানার কৌতূহলে আরও বেশ কিছু মানুষ জড়ো হলেন। ভিড়ের মধ্যে নজরে এল মন্দিরের প্রধান পুরোহিত একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী ব্যাঙ হাতে দাঁড়িয়ে। সিঁদুর দেওয়া হল স্ত্রী ব্যাঙের মাথায়। মন্ত্রোচ্চারণ আর কাসর ঘন্টার আওয়াজে চারদিক মুখরিত । নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী বললেন বৃষ্টির

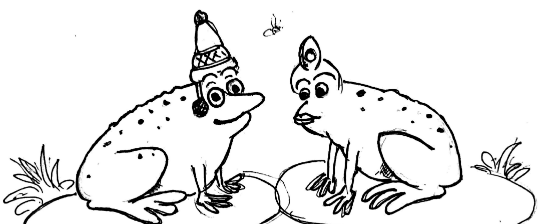

দেবতাকে তুষ্ট করতে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হল!

সংবাদ মাধ্যমে এই মহিয়সী জনদরদী মন্ত্রী কুসংস্কারে মদত দিচ্ছেন অভিযোগ ওঠায় গত ২২শে জুন শ্রীমতী যাদব সংবাদ সংস্থাকে জানান “খরা পীড়িত বুন্দেলখন্ড অঞ্চলের কল্যাণে এবং কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে আমরা বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি।”

এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ঝড় ওঠায় মন্দিরের পূজারী আচার্য ব্রিজ নন্দন সুর পাল্টে সংবাদ সংস্থাকে বলেন “এখানে বর্ষবরণের জন্যই ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া হয়। এটি এই মন্দিরের বহু প্রাচীন রীতি।” ■

(তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ০২/০৮/১৮, এ এন আই ২৭.০৭.১৮)

বিশেষ রচনা ঃ

ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এবং পুরাণ কাহিনী

দশাবতার

ভূমিকা ঃ সেলাম করো আমাদের পুরাণকে!

অন্তর্জাল ভেদ করে আলোর মত এসে উপস্থিত হল এই নির্দেশ! অবশ্য এটা একটা মাত্র নয় – এরকম অনেক বার্তার মধ্যে এটা একটা। যাই হোক দেখা যাক সেলাম কাকে করবো!

"মা, আমি একজন বিজ্ঞানী – বিষয় হল জীন চর্চা। আমি মানব বিবর্তনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছি। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব – চার্লস ডারউইন – তুমি কি তাঁর নাম শুনেছো?" – বাসু প্রশ্ন করলো।

তার মা পাশে বসে হাসল এবং বললো "আমি ডারউইন সম্পর্কে জানি কিন্তু তুমি কি 'দশাবতার' সম্পর্কে শুনেছো? বিষ্ণুর দশটি অবতার?"

বাসু – "না"।

মা – "ঠিক আছে। তাহলে আমার কথা শোন সেটা তুমি বা তোমার ডারউইনও জানতে পারেনি। মন দিয়ে শোন –

প্রথম অবতার হল **'মৎস'** অবতার – যার মানে হল **মাছ**। এর অর্থ হল প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল জল থেকে। কি ঠিক তো?

বাসু এবার একটু মনোযোগ দিতে বাধ্য হল।

মা বলে চললেন, "এরপর এলেন **কূম** অবতার – মানে হল **কচ্ছপ**। অর্থাৎ জীবন জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে এসেছিল। উভচর। তাই কচ্ছপ হল জল থেকে জমিতে প্রাণের বিবর্তনের প্রতীক।

তৃতীয় অবতার হল **বরাহ**। **বণ্য শূকর**। যার অর্থ হল জংলী জানোয়ার – বুদ্ধিবৃত্তি নেই। তুমি তাকে ডায়ানোসোর বলতে পারো। কী ঠিক না?" বাসু'র চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"চতুর্থ অবতার হলেন **নরসিংহ, অর্দ্ধমানব** – যা হল বন্য জন্তু থেকে বুদ্ধিমান সৃষ্টিতে উত্তরণের প্রতীক।

পঞ্চম হল **বামন** অবতার – **ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের** কিন্তু যে লম্বা হতে পারে। কেন সেটা জানো কী? তা হল দু'ধরনের মানব ছিল। হোমো ইরেকটাস্ এবং হোমো সেপিয়েন্স। যার মধ্যে হোমো সেপিয়েন্সই সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছিল।" বাসু অবাক হয়ে দেখে তার মা অনর্গল তরঙ্গের মত বলে যাচ্ছে। সে নির্বাক বিস্ময়ে শুনতে লাগলো।

"ষষ্ঠ অবতার হল **পরশুরাম**। যে কুঠার আবিষ্কার করেছিল। সে **গুহাবাসী অরণ্যচারী**। রূঢ় এবং অসামাজিক।

সপ্তম হলেন **রাম**। **প্রথম যুক্তিবাদী চিন্তার সামাজিক মানুষের প্রতীক**। যিনি সমাজের নিয়ম এবং মানবিক মূল্যবোধ নির্মাণ করেছেন ও তাকে অনুশীলন করেছেন।

অষ্টম অবতার হলেন **বলরাম**। **প্রকৃত কৃষক** যিনি জীবনযাপনে কৃষির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নবম হলেন **কৃষ্ণ**। **রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিজ্ঞ, রাজনীতি বিশারদ – অতুলনীয় প্রবক্তা!** তিনি হলেন সেই প্রেমিক যিনি সমাজের ক্রীড়ায় মগ্ন থেকেও শিখিয়ে গেছেন কিভাবে এই অধার্মিক সামাজিক ব্যবস্থায় জীবনতরণী বেয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

শেষে, সোনা আমার – আসবেন **কল্কী**। যাকে আনার কাজে তোমরা নিযুক্ত আছো। **সেই মানুষ যে জীনগতভাবে শ্রেষ্ঠ**।"

বাসু বাকরুদ্ধ হয়ে তার মার দিকে তাকিয়ে থাকে। শেষে আধোস্বরে বলে উঠে – "চমৎকার! তুমি এসব ... ! অত্যাশ্চর্য্য ..."

মা বলে চললেন "এই সত্য। আমরা ভারতীয়রা অত্যাশ্চর্য্য সব বিষয় জানি। কিন্তু কেবল এটুকু জানিনা কিভাবে সেটাকে বিজ্ঞান সম্মতরূপে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সেটাকে পৌরাণিক গল্পের রূপ দিয়ে ফেলি। পুরাণ মানুষের মধ্যে আস্থা-বিশ্বাস সৃষ্টি করে। তাকে বিচক্ষণ করে তোলে। এখন তুমি সেটাকে যেভাবেই নাও

না কেন – ধার্মিক অথবা বৈজ্ঞানিক সেটা তোমার ইচ্ছে।

বাসু তার মায়ের পদস্পর্শ করে। মা তাকে জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে কপালে চুম্বন এঁকে দেন।"

পরিশেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই কাহিনী অবশ্য পাঠ্য এবং অবশ্য প্রচারযোগ্য বিশেষতঃ তাদের জন্য যাঁরা পশ্চিমী দুনিয়াকে শ্রেষ্ঠ আর অনুসরণযোগ্য মনে করে।

অতএব বিজ্ঞান মনস্কর দরবারে (কিঞ্চিৎ টীকা সহ) প্রচার করতেই হল!

বেশ একটা নিটোল ভারতীয় পারিবারিক 'চিত্রনাট্য'! পাশ্চাত্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণারত ছেলে মায়ের মুখ থেকে 'দশাবতারের' ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে পেরে গেল 'হিন্দু' পুরাণে বহু পূর্বেই সর্ববিদ্যা বর্ণনা করা আছে। পূর্ব থেকে নির্ধারিত এই পরম 'সত্য' আমরা প্রথম থেকেই জানি। পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান সে সবই এখন জানছে মাত্র!

দশাবতার

হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী 'ব্রহ্মান্ড' এর সংরক্ষক বিষ্ণু অধর্মকে নাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। দশটি অবতার রূপে তিনি অবতরণ করেছেন বা করবেন। এই দশ অবতারের তালিকা আবার বিভিন্ন শাস্ত্র, সম্প্রদায়, ধারা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। যেমন পূর্বোক্ত বার্তাটিতে অষ্টম অবতার রূপে 'বলরাম' কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি 'শ্রী বৈষ্ণব' সম্প্রদায় দ্বারা মান্য তালিকা, যে সম্প্রদায়ের মূল দার্শনিক প্রবক্তা রামানুজ (যিনি বিশিষ্ট দ্বৈত বেদান্ত ধারার প্রবর্তন করেন।) একাদশ শতাব্দী, বর্তমানের তামিলনাড়ুতে যার উৎসভূমি। অন্যদিকে গুপ্ত যুগে (৩৩০ – ৫৫০ অব্দ) গৌতম বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হতে শুরু করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন **পুরাণে বুদ্ধকে নবম অবতার রূপে** মান্যতা দেওয়া হয়েছে। **সেই তালিকায় বলরাম বাদ গেছেন** এবং **কৃষ্ণ হয়েছেন অষ্টম অবতার**। মহারাষ্ট্র ও গোয়ায় **নবম অবতার রূপে 'বিঠ্‌ঠল'** বা **'বিথব'** ও **উড়িষ্যায় 'জগন্নাথ'কে স্থান দেওয়া হয়েছে বুদ্ধের স্থানে**। অর্থাৎ অঞ্চল ভেদে অবতারের ভিন্নতা আছে।

যুগ পরিচয়

অবতারগুলির মধ্যে প্রথম চারটি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নরসিংহ অবতীর্ণ হয়েছিলেন সত্য যুগে, বামন থেকে রাম ত্রেতা যুগে। কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আর বুদ্ধ ও কল্কী কলিযুগে।

সত্য যুগ হল স্বর্ণ যুগ। যেখানে ধর্ম চার পায়ে অর্থাৎ পূর্ণ রূপে দাঁড়িয়ে আছে। এই যুগ **১৭ লক্ষ ২৮ হাজার** বছর স্থায়ী। মহাভারত মহাকাব্য অনুযায়ী সত্য যুগে ধনী-দরিদ্র নেই। মানবের ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সকল কিছু লাভ করা যায় তাই শ্রমের প্রয়োজন নেই। কোন রোগ জ্বালা নেই। ঘৃণা বা দম্ভ নেই। অসৎ চিন্তা, দুঃখ বা ভয় নেই। মানবজাতি আশীর্বাদ রূপে চরমতম যা চাইতে পারে তার সবই সে সত্য যুগে পায়। এই যুগে মানুষের আয়ু ৪০০০ বছর।

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-দান ধর্মে নিয়োজিত থাকে। ক্ষত্রিয় নিয়োজিত থাকে শক্তি অর্জন ও প্রদর্শনে। বৈশ্য ন্যায় ও সততার সাথে ব্যবসা করে আর শুদ্র একনিষ্ঠভাবে উপরোক্ত তিনটি বর্ণকে সেবা করে।

সুতরাং সত্যযুগে শ্রেণী ও বর্ণবিভাজন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

ত্রেতা যুগ ঃ – ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার মনুষ্য বছর ব্যাপী এই যুগে ধর্ম তিন পায়ে বিদ্যমান, এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কেবল ইচ্ছা শক্তির জোরে আকাংখা পূরণ করতে পারেনা সক্রিয় কর্মে নিযুক্ত হয়ে হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন, মরুভূমি ও সমুদ্রের জন্ম হয়। কৃষি কাজ ও খনিজ উত্তোলন শুরু হয়। সমাজকে নিয়ন্ত্রনে রাখার জন্য নিয়ম ও আইন প্রণয়ন করতে হয়। মিথ্যাচার, হিংসা, অতৃপ্তি ও কলহের সূচনা হয়।

দ্বাপর যুগ – এই যুগ ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার বছর স্থায়ী। এই যুগে উচ্চবর্গের মানুষের স্বর্গীয় বুদ্ধিদীপ্তি লোপ পেয়েছে। সত্যবাদিতা আংশিক অবশিষ্ট। চাতুরী-রোগভোগ-কামনা বাসনার আধিক্য ধর্মকে দুপায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এই যুগে ব্রাহ্মণ যজ্ঞকার্যে আর ক্ষত্রিয় আপন প্রজাকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত। ভগবৎ পুরাণ মতে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলে এই যুগের সমাপ্তি।

চারযুগের শেষ হল **কলিযুগ**। আর্যভট্টের মতে এই যুগের সূত্রপাত ৩১০২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এযুগে ধর্ম কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে একপায়ে। মানুষ উপযুক্ত কারণ ছাড়াই একে অন্যের বিরুদ্ধে, সঙ্গত কারণ ছাড়াই সংঘর্ষে লিপ্ত।

ঘোর কলিকাল যখন পাপাচারে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কল্কী অবতার অবতীর্ণ হবেন। যুগের অন্ত হবে। পুনরায় সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাশি রাশি ভিন্নতার মধ্যে 'যুগের' এক সাধারণ পরিচয় এজন্য দেওয়া প্রয়োজন যে এই তথাকথিত 'অবতার'রা 'অবতীর্ণ' হয়েছেন মানব সমাজেরই বিভিন্ন সংকট কালে! অত্যন্ত অগোছালো, শৃঙ্খলাহীন, অসংগতি বা বিসংগতিতে পূর্ণ এই যুগ বিভাজন আসলে মানব সমাজকে, তার বিকাশকেই কল্পিতরূপে অনুসরণ করতে চায়। যার সূচনা থেকে শেষ বিকাশের গতি নিম্নমুখী। অন্যদিকে যুগের সূচনাকাল থেকেই মানবসমাজ শ্রেণী ও বর্ণে বিভাজিত।

সুতরাং বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত 'অবতার'দের সাথে প্রজাতিগত

বিবর্তন বা নিম্নশ্রেণীর অনুজীব থেকে ক্রমশঃ উচ্চতর ও জটিলতর প্রাণের বিবর্তনের কোনমাত্র সম্পর্ক নেই।

প্রসঙ্গত আদি বৈদিক সাহিত্যে এই যুগ বিভাগ দেখা যায় না স্বভাবতই। পরবর্তী বিভিন্ন পুরাণ ও স্মৃতিতে এদের উল্লেখ আছে ভিন্নতাসহ।

প্রাণের বিবর্তনের অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

একথা বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মতরূপে প্রমাণিত যে কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন ও অন্যান্য মৌল এবং তাদের যৌগগুলি বিশেষরূপে সংশ্লেষিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যে আদি এককোষী অনুজীব – তার জন্ম জলে। তাকে মেরুদন্ডী প্রাণীর প্রথম ধাপ মৎস্য রূপে কল্পনা করা মস্তিষ্কের উর্বরতার লক্ষণমাত্র! প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিৎ বিষ্ণুর **'মৎস্য'** অবতারের সাথে যে প্লাবনের 'মিথ' যুক্ত আছে তা অন্যান্য আধুনিক ধর্ম বাদ দিলেও আফ্রিকা-আমেরিকা-সুমেরীয় মেসোপটেমীয় সভ্যতার আদি গাথা ও গ্রন্থেও 'আশ্চর্য্য' মিল সহ সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

আবার **'বরাহ'** অবতার মানে স্তন্যপায়ী শূকর। তাকে যদি তাদের ট্রায়াসিক যুগের সরীসৃপ ডায়নোসরের সাথে তুলনা করা হয় তবে সেটা এমনকি হাস্য উদ্রেকও করে না।

বামন অবতার 'ক্ষুদ্র' দৈর্ঘ্যের। সে নাকি হোমো ইরেকটাস এর প্রতীক। আরেক ধরনের লম্বা মানুষ ছিল হোমো সেপিয়েন্স।

কত সহজেই মনগড়া বক্তব্যগুলিকে উগ্র আত্মম্ভরিতার জামা পরিয়ে দিয়ে দুনিয়া জুড়ে জীবাশ্ম বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার অধ্যবসায়ী প্রচেস্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়। হোমো ইরেকটাস প্লাইসটোসিন যুগে বাস করতো। আজ পর্যন্ত তার প্রাচীনতম জীবাশ্ম যা পাওয়া গেছে তা ১৮ লক্ষ বছর পূর্বেকার। এদের গড় উচ্চতা ছিল ১.৭৯ মি (৫ ফুট ১০ ইঞ্চি)। আধুনিক (হোমো সেপিয়েন্স) পুরুষদের মাত্র ১৭ শতাংশ দৈর্ঘ্যে এদের চেয়ে বেশি!

আধুনিক মানবরূপী যে অবতার যেমন **পরশুরাম** থেকে **কৃষ্ণ** পর্যন্ত তাদের জীবনাদর্শ বা মূল্যবোধ এই রচনার বিষয়বস্তু নয়।

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান বিরোধী বা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কোন বার্তা প্রচার করে ছাপ ফেলা মুশকিল, তাই বিজ্ঞানের মোড়কে অবৈজ্ঞানিক মতামতগুলিকে জনমানসে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে।

ডারউইন সাহেবের বিরুদ্ধে এত ঝাঁঝ কেন?

চার্লস ডারউইন (১৮০৯ – ১৮৮২) এর বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশেষরূপে বানর ও মানুষের বিবর্তনমূলক সম্পর্ক কেবল উগ্রহিন্দুবাদীদের দ্বারা নয় ইসলাম, খ্রীষ্টান ধর্মীয় উগ্রবাদীদের দ্বারাও একইভাবে পরিত্যাজ্য ও সমালোচিত। কারণটাও সহজেই অনুমেয়। তাঁদের ব্যাখ্যা হল সমগ্র মহাবিশ্ব, প্রকৃতিজগৎ এবং তার মধ্যে জীবজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস-কল্পনার যা কিছু বিরোধী তাই মিথ্যে। তাই ডারউইন সাহেবের জাজ্বল্যমান প্রমাণগুলি যুগে যুগে তাদের জ্বালা ধরায় ও ধরিয়ে যাবে।

বর্তমানে ভারতের মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের (শিক্ষা দপ্তর এই মন্ত্রকেই পড়ে) রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যপাল সিং সমগ্র হিন্দুবাদীদের হয়ে ডারউইন নস্যাৎ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভারতের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা এর বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রতিবাদ করেছেন। [পরিশিষ্ট]

চার্লস ডারউইন প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক, যদিও আধুনিক বিবর্তনবাদের জনক রূপে চার্লস ডারউইনকেই চিহ্নিত করা হয় তবু সমস্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের মত এক্ষেত্রেও শেষ কথা বলে কিছু হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে সেই সময় কণা পদার্থবিদ্যা, তেজস্ক্রীয়তা, রেডিয়ো আইসোটোপ অনুজীববিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের ফলিত শাখাগুলির বিকাশ সেভাবে হয়নি। তার প্রয়োগের প্রশ্ন তো দূর। তাই ডারউইন পরবর্তীকালে এবিষয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। যা বিবর্তনবাদকে আরও প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে আবার ডারউইনের সীমাবদ্ধতাকেও তুলে ধরেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিটি নব নব আবিষ্কার ডারউইনের মূল তত্ত্বটিকে সমর্থন করেছে, নাকচ করতে পারেনি।

পুরাণ কথা

পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন যুগের কথা বা গাথা। যে সময়ের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না তাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে। স্বভাবতই পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলী বা তত্ত্ব-দর্শন সবই প্রাগৈতিহাসিক যুগের। হিন্দু পুরাণ বলে যা বা যেগুলি পরিচিত তা মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধীয় পুরাণও বর্তমান। হিন্দু পুরাণে লেখকের নাম নেই। সহজেই অনুমেয় যে এগুলি বহু মানুষের দ্বারা লিখিত এবং একই পুরাণ এর বহু পান্ডুলিপি আছে যা পরস্পরের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ বহু রচয়িতার দ্বারা কয়েক শতাব্দী ধরে লিখিত এক একটি পুরাণকথা তার লিখিত রূপের পূর্বে বহু বহু যুগ ধরে লোকথারূপে মুখে মুখে ফিরেছে।

হিন্দু পুরাণের মধ্যে ১৮টি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণের উল্লেখ আছে। এই ১৮টি মহাপুরাণ আবার ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণে বিভক্ত। এই সকল পুরাণই বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী কালে রচিত। এই পুরাণগুলিতে মহাবিশ্বতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবতা-উপদেবতাদের কাহিনী, রাজা-ঋষি-নায়ক-ধর্মস্থান-চিকিৎসাবিদ্যা-জ্যোতিষ-ব্যাকরণ-প্রেম কথা-দর্শন-ধর্মস্থান সমেত সকল বিষয়ই

স্থান পেয়েছে। এবং বর্তমান গবেষণায় মোটের উপর দেখা যায় যে এগুলি **তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ ও তার পরবর্তী সময়ে লিখিত।**

এ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম বা নৈতিকতার আকার গ্রন্থরূপে পরিচিত **'গীতা'**র উল্লেখ করা প্রয়োজন। মোটের উপর গীতা বলতে বেশিরভাগই 'ভাগবৎ গীতা' বোঝেন। যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরিচিত করাচ্ছেন। কিন্তু 'পঞ্চাশটি'র ও অধিক 'গীতা' বর্তমান। কয়েকটা হল – অবধূত গীতা, অনু গীতা, ব্রহ্ম গীতা, জনক গীতা, রাম গীতা, গুরু গীতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামায়ণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় "The Ramayana : It's character, Genesis, History, Expansion and Exodus" প্রবন্ধে যা লিখেছেন তাকে সারসংক্ষেপ করলে বার হয়ে আসে ...

(১) দশরথ জাতক নাম ১৩টি পালি গাথা রামায়ণের ঘটনা প্রবাহের গতি নির্দেশ করে।

(২) রাম কাহিনীতে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন স্থানের লোক কথার বিভিন্ন কাহিনীর রেণুর (লোক কথার ক্ষুদ্রতম অংশ) মিশ্রণ ঘটেছে। বাল্মিকী রামায়ণের পূর্বেও রাম কাহিনী প্রচলিত ছিল। যার শ্লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০০। বর্তমানে শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৬,০০০। রামায়ণে চারটি 'ভাষা যুগের' সুস্পষ্ট প্রভাব ধরা পড়ে।

(৩) ভারতে তথা ভারতের বাইরে সে অগুন্তি রামকাহিনী রূপ পেয়েছে তা থেকে সমগ্র এশিয়া ভূখন্ডের এক সাংস্কৃতিক রূপরেখা পাওয়া যায়।

(৪) রাম মানব রূপ পরিগ্রহকারী এক কল্পপুরুষ।

প্রসঙ্গত আজ সংখ্যাগুরু ধর্ম দ্বারা লালিত কাহিনী বা রীতিকে খন্ডন করলে তার বিরুদ্ধে হিংস্র অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটছে। এটা কেবল আজকের ঘটনা নয়। উক্ত প্রবন্ধ ডঃ চট্টোপাধ্যায় জীবদ্দশায় প্রকাশ করতে পারেননি। যদিও পরবর্তী বহু ঐতিহাসিক গবেষক তাঁর মতামতকে তথ্য ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সঠিক রূপে গ্রহণ করেছেন। উক্ত দশরথ জাতকে রাম ও সীতা পরস্পর ভাই-বোন রূপে চিহ্নিত। বার্মা (মায়ানমার), লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রামকাহিনীগুলির মধ্যে ভাবগত ঐক্য বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু অঞ্চল ভেদে নিজস্ব লোকগাথার রেণুগুলি মূল ভাবের উপর প্রযুক্ত হয়। তাই রামকাহিনীর বিস্তৃতি সমগ্র এশিয়া জুড়ে। এমনকি আফ্রিকার জুলু উপজাতির মধ্যে প্রচলিত লোক সাহিত্যে রামায়ণের অনুরূপ কাহিনী বিন্যাস দেখা যায়। বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সুতরাং সাহিত্য মূল্য রূপে রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এখন একটা মহাদেশীয় মহাকাব্য সার্থক হতে পারে তখনই যখন তা অন্ততঃ পক্ষে তার সমসাময়িক সমাজ জীবন – তারা দ্বন্দ্ব-অন্ত র্বিরোধকে প্রস্ফুটিত করে। সুতরাং তার মধ্যে ঐতিহাসিক নির্যাস থাকতেই হবে। রামায়ণেও রয়েছে। বহু যুগ ধরে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী এবং তাদের শাখা প্রশাখাগুলিকে পরাজিত করে 'আর্য্য' নামে কথিত মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তার এই প্রেক্ষাপটে লেখা মহাকাব্য হল রামায়ণ। কিন্তু সেটাকে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বিজ্ঞান বলে না। অর্থাৎ 'রামায়ণ' বর্ণিত সময় বর্তমান ছিল। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-পরিপ্রেক্ষিত – এর পারম্পর্য্য আর তাদের আন্তসম্পর্ক প্রমাণ করতে গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক-পুরাতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। রামায়ণের ক্ষেত্রে এরকম কোন প্রমাণ হাজির হয়নি। বরং প্রত্ন প্রমাণগুলি অসংগতিকেই চিহ্নিত করেছে। এটা কেবল রামায়ণ বা হিন্দু পুরাণ বলে নয় প্রতিটি 'প্রাগৈতিহাসিক' মিথ বা মাইথালজি বা পুরাণ সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

পৌরাণিক কাহিনীকে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের জায়গায় প্রতিস্থাপনের এই অভিযানের কারণ কী?

এর উৎস না আছে পুরাণে আর না এর সাথে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক আছে। এর উৎস নিহিত আছে বর্তমান অর্থনীতি সমাজনীতি আর রাজনীতির মধ্যে। এটাও বলা প্রয়োজন যে কেবল ভারত বা ভারতীয় ভূখন্ডের সংখ্যাগুরু হিন্দু পুরাণ সম্পর্কেই কেবলমাত্র একথা প্রযোজ্য নয়। প্রতিটি মহাদেশে এমনকি প্রতিটি দেশেই সংখ্যাগুরু বা আধিপত্যকারী ধর্মীয় গোষ্ঠী-ভাষা গোষ্ঠী-জনজাতীর (আদিবাসী) গোষ্ঠী-বর্ণ ভিত্তিক (গায়ের চামড়ার রং) গোষ্ঠী-জাতিগোষ্ঠীর তথাকথিত 'প্রাচীন ঐহিত্য অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা ও প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বহুদিন ধরেই চলছে।' ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের জায়গায় পৌরাণিক কাহিনীকে স্থান দেওয়া হল ব্যাপক জনসংখ্যাকে বিভাজিত করার তত্ত্বগত নির্মাণ। যার উপর দাঁড়িয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলিকে দমন করার, বিদ্বেষ সৃষ্টি করার, দাঙ্গা পরিচালনা করার এমনকি যুদ্ধ, নতুন রাষ্ট্রসৃষ্টি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হয়। অন্যদিকে এর প্রতিক্রিয়ায় বিপরীত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যেও বিদ্বেষ-উগ্রবাদ-সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করা যায়। যা মূল পরিকল্পনাকেই গতি প্রদান করে। আমি বা আমরা শ্রেষ্ঠ। আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ। জগতে যা কিছু উন্নত উত্তম আমরাই তার উত্তরাধিকারী, সুতরাং আমাদের সেই আধিপত্যের ধারা বজায় রাখতে হবে। অন্যদের বা অন্যদের মধ্যে 'নির্দিষ্ট'দের আমাদের দাপট-সংস্কৃতি-পোশাক-খাদ্যাভ্যাস-ভাষা ইত্যাদিকে মেনে নিয়ে পায়ের তলায় থাকতে হবে অথবা থাকতে 'হবেই

না'! আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এর নজির প্রচুর।

"অতীতের সমস্ত সৃজনশীল কীর্তিই নর্ডিক উৎস থেকে এসেছে। ... মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে জার্মান জাতিসত্ত্বার মধ্য দিয়ে' 'জার্মান জাতি মহাশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং গভীর একাত্মতা অনুভব করে'। 'আমাদের জাতীয় দাসত্বের জন্য দায়ী ইহুদীরা, ... আমাদের জাতিকে তারা নষ্ট করছে, আমাদের নৈতিকতাকে পচন ধরিয়েছে। ... এদের নিশ্চিহ্ন করা আমাদের কর্তব্য।' 'সামরিক বাহিনীর জঙ্গীদের মধ্যেই জার্মান জাতির সুমহান ঐতিহ্য সর্বোত্তম ভাবে প্রকাশ পায়।" **–অ্যাডলফ হিটলার**

জার্মান রাষ্ট্রনেতা তথা নাৎসী পার্টির নেতা অ্যাডলফ হিটলারের সাথে হুবহু মিল পাওয়া যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ 'গুরুজী' **মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার** দ্বারা পেশ করা বক্তব্যে।

"যেহেতু একথা প্রশ্নাতীত ভাবেই প্রমাণিত যে হিন্দুস্তান হল হিন্দুদের ভূমি এবং একমাত্র হিন্দু জাতিই এখানে বিকশিত হতে পারে, তাহলে এদেশে বাস করে অথচ হিন্দু জাতি, ধর্ম বা সংস্কৃতির কেউ নয় এমন মানুষদের কী হবে? ... আমাদের মতে জাতীয় জীবনে তাদের কোন স্থান নেই, যদি না তারা তাদের ভিন্নমত পরিত্যাগ করে এবং জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করে সমগ্র জাতির সঙ্গে মিশে যায়। যতদিন তারা তাদের জাতিগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক পার্থক্য বজায় রাখবে ততদিন তাদের বিদেশী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়না।" (We or our Nation hood Defined – পৃষ্ঠা ৪৫)

"একমাত্র তারাই হল জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক, যারা হিন্দু জাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য নিবেদিত এছাড়া অন্যরা সকলেই হল বিশ্বাসঘাতক, শত্রু বা নরম ভাষায় বলতে গেলে নির্বোধ।" (ঐ – পৃষ্ঠা ৪৪)

"এই সব বিদেশীদের পক্ষে দুটো রাস্তা খোলা। হয় তারা জাতিসত্ত্বার (হিন্দু) সাথে মিশে যাক এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ করুক অথবা জাতির দয়ায় তারা থাকুক এবং জাতির ইচ্ছা হলে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাক। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে এটাই একমাত্র সঠিক, যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী। (ঐ – পৃষ্ঠা ৪৭)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে তত্ত্বগতভাবে 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠন যাদের ঘোষিত লক্ষ্য তারা বাদ দিলেও তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' পন্থী বেশিরভাগ দলই অঘোষিতভাবে একই পথের পথিক। আবার এর বিপরীতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের নামে উগ্র ধর্মোম্মাদ একই মুদ্রার উল্টো পিঠ। আন্তর্জাতিক স্তরে দেখা যায় খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-ইহুদী-মুসলিম ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের আড়ালে দেশভাগ-দমন-বিতাড়ন-যুদ্ধ দৈনন্দিন ঘটনা। শুধু তাই নয় একই ধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ধারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। একথা এখন সর্বজনবিদিত যে সমগ্র আরব দুনিয়ায় তৈল সম্পদের উপর দখলদারীর জন্য যুদ্ধে মুখোশ হল ইসলামেরই দুই ধারা শিয়া ও সুন্নীর মধ্যকার বিরোধ। ছোট্ট দেশ যুগোশ্লাভিয়া। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিকল্পনায় তাকে খন্ড বিখন্ড করা হল নৃশংস জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষ চারিয়ে দিয়ে। সার্বিয়া বনাম ক্রোয়েশিয়া। অর্থোডক্স বনাম ক্যাথলিক খ্রীষ্টান! ... বনাম বসনিয়া – খ্রীষ্টান বনাম ইসলাম। বাড়ির পাশেই মায়ানমার। রাখাইন প্রদেশ থেকে মুসলিমদের উৎখাত করার জন্য 'বৌদ্ধ' উগ্রধর্মবাদকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। একই উগ্রতা তামিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। মধ্যপ্রাচ্যের তথাকথিত 'সকল দ্বন্দ্বের উৎস' – আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ। তারও সূত্র হল ইসলাম ও ইহুদী শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব। এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রভুরা একটা আস্ত দেশ তার ভূখন্ড এবং জনগণকেও ভ্যানিস করে দিতে তৎপর। ঘটনা হল উদাহরণ শেষ হবে না। খোদ ভারতীয় ভূখন্ড রাজনৈতিক কারণে বিভাজিত হয়েছে। জনতাকে বিভাজিত করা হয়েছে ধর্মবিদ্বেষের নারকীয় তান্ডব সৃষ্টি করে। এখানেই শেষ এমন মনে করার কোন মাত্র কারণ নেই।

পরিশেষে এটা বলতেই হবে যে ব্যাপক জনসমষ্টি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা সৃষ্টি করেনা। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব আর অন্যের হীনতার বিষবাষ্পে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলেনা। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের সকল রকম ভিন্নতা নিয়েই পাশাপাশি থাকে, থেকে যায়। আদান প্রদানের মধ্যে দিয়েই ভাষা-সংস্কৃতি-খাদ্যাভ্যাস-পোশাক পাল্টে পাল্টে পায়। দেশীয়-ধর্মীয়-জাতীয়-ভূখন্ডগত সীমা রেখা মুছে যেতে থাকে। কিন্তু তাঁদের হাতে 'ভুবণের ভার' নেই। তাঁরা শিকার হন বিভেদের। গৃহহীন-স্বজনহীন-দেশহীন পরিচয়হীন হয়ে যান উন্মত্ত তান্ডবের মুখোমুখি হয়ে। ঐতিহাসিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন বিজ্ঞান কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য হল পুরাণ আর অতীত গৌরবের নামে আজকের দিনে বিদ্বেষ-ঘৃণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলে ধরা।

পরিশিষ্ট

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যপাল সিং মহাশয় গত ২০শে জানুয়ারী ২০১৮ ঔরঙ্গাবাদ (মহারাষ্ট্র) এ অনুষ্ঠিত সারা ভারত বৈদিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে বলেন "প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কিত ডারউইনের তত্ত্ব ভুল। ৩০-৩৫ বছর আগেই বিজ্ঞানীরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং মানুষ বানর থেকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে এটা ভুল এবং একথার উল্লেখ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে মুছে ফেলা দরকার। মানুষকে যবে থেকে পৃথিবীতে দেখা গেছে – সে বরাবর মানুষ হিসেবেই রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউই

না মৌখিকভাবে না লিখিতভাবে বলে গেছেন যে তাঁরা কোন বানর (ape) থেকে মানুষে পরিবর্তিত হতে দেখেছেন।

মন্ত্রী মহাশয়ের এই কথাটা হঠাৎ বলে ফেলা নয়। সেজন্য একটি পুস্তক প্রকাশের অনুষ্ঠানে **৩০শে জুন** তিনি পুনরায় বলেন "আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। রসায়নে পি. এইচ. ডি করেছি। যারা আমার বিরুদ্ধে বলছে তারা কারা? আজ অথবা কাল, কাল না হলে ১০-২০ বছরের মধ্যেই আমি যা বলেছি লোকে তাই মেনে নেবে। অন্তত আমি মনে করি আমার পূর্বপুরুষ বানর (ape) ছিল না।"

মুম্বই-এর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার এবং বর্তমান মন্ত্রী আরো বলেন "আমি একজন শিক্ষিত রাজনীতিক হিসেবে গর্বিত এবং এটা দেশের মানুষের সৌভাগ্য যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিপুষ্ট এক জাতীয়তাবাদী সরকার বর্তমানে ক্ষমতাসীন। বিদেশের নিরানব্বই শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুত্বের অপব্যাখ্যা করে।"

"আমি একটা বই লিখছি। ... যাতে এবিষয়ে এক অধ্যায় থাকবে। আমরা পশ্চিমীদের কোন সাহায্য নেব না। আমরা মান্য এবং প্রামাণ্য তথ্য দেব আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে। আমাদের কোন ঋষি কি ইংলন্ডের কোন অধ্যাপকের কাছে তার বিষয়ে প্রমাণ দেবার দাবী করেছিলেন নাকি?"

মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য ভারতের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরা মেনে নেননি। ২১শে জানুয়ারী থেকে দুদিনের মধ্যে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (on-line) একটি প্রতিবাদ পত্রে তিন হাজার জন স্বাক্ষর করেন। প্রতিবাদপত্রটির বয়ানের সংক্ষিপ্ত অংশ নিম্নরূপ ঃ

"আমরা, বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী, জনগণের মধ্যকার বিজ্ঞানমনস্করা, আপনার ঐ উক্তির জন্য গভীরভাবে বিচলিত। বিবর্তনবাদী তত্ত্ব বিজ্ঞানী মহল বাতিল করে দিয়েছে এটা বলা তথ্যগতভাবে ঠিক নয়। বিপরীত, প্রতিটি নতুন আবিষ্কার ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গীকেই সমর্থন জানিয়েছে, ... মানুষ বানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে বা হয়নি এ ধরনের বক্তব্য বিষয়টির অতিসরলীকরণ মাত্র যা বিবর্তনের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা পেশ করে। মানুষ এবং অন্যান্য বৃহৎ এপ (ape) রা এবং বানরের পিতৃপুরুষ একই – এর প্রচুর ও অলঙ্ঘনীয় প্রমাণ আছে।

"আপনি এও দাবী করেছেন যে বেদেই সব সমস্যার উত্তর রয়েছে। এই রকম উদ্ভট দাবী কোন তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায়না। সাথে সাথে এই রকম দাবী ভারতের বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতার ইতিহাসের ওপর যে প্রকৃত গবেষণা হয়েছে তার প্রতি অবমাননা।

"যখন মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কোন মন্ত্রী এই ধরণের দাবী করেন তখন যারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে এবং যুক্তিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমালোচনামূলক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত করার চেষ্টা করছেন সেই বৈজ্ঞানিক মহলকে আঘাত করে, তাদের চেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এইসব দাবী বিশ্বস্তরে দেশের ছবিকে ছোট করে দেয় এবং ভারতীয় গবেষকদের দ্বারা প্রকৃত গবেষণাগুলির প্রতি আন্তর্জাতিক গবেষক মহলে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

সুতরাং যে উক্তি আপনি সর্বভারতীয় বৈদিক সম্মেলনে করেছিলেন তা অবিলম্বে ফিরিয়ে নিতে বলছি এবং আপনার মন্ত্রকের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে কি পলিসি তা ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞপ্তি জারী করার দাবী করছি। [প্রতিবাদপত্রটিকে কতগুলি প্রধান গবেষনা সংস্থার স্বনামধন্য বিজ্ঞানীরা স্বাক্ষর করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন – গোবিন্দ স্বরূপ, প্রাক্তন সেন্টার ডিরেক্টর NCRA (TIFR) পুণে; জয়শ্রী রামদাস, প্রাক্তন সেন্টার ডিরেক্টর, HBCSE (TIFR) মুম্বাই; নরেশ দাদিক প্রাক্তন ডিরেক্টর IUCAA পুণে; দীপক মাথুর, প্রাক্তন ডিরেক্টর ইউ. এম – DAE, CEBS, মুম্বাই; শ্রীকান্ত বহুলকার, সাম্মানিক সচিব, ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুণে এবং অন্যরা।]

বিজ্ঞানী মহলের বিরোধিতার সামনে দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর মন্তব্য করেছেন – "আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি, এবং এমন মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেছি যাতে বিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে সত্যপাল সিং জানাতে বাধ্য হন যে "CBSE দ্বাদশ শ্রেণির বায়োলজি [জীববিদ্যা] পাঠক্রমে প্রজাতির বিবর্তন সম্বন্ধীয় ডারউইনের তত্ত্ব পড়ানো হয়। মন্ত্রক এ বিষয়ে বিদ্যালয় ও কলেজ স্তরে কোন পরিবর্তন বিবেচনা করছে না।" [PTI ২৩শে জানুয়ারী ২০১৮ ও ৮ই ফেব্রুয়ারি ইকনমিক টাইমস]

সরকার পোষিত সংস্থাগুলিও যে এই উদ্দেশ্যপূর্ণ মন্তব্য মেনে নেয়নি তা বোঝা যায় যখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (AISER) পুণে স্নাতকস্তরের সেমেষ্টার পরীক্ষায় প্রশ্ন করে (২২শে ফেব্রুয়ারি ২০১৮) – "সম্প্রতি ভারতের মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দাবী করেছেন যে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ভুল কারণ 'আমাদের পূর্বপুরুষ সমেত কেউ-ই মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে বলে যায়নি যে তাঁরা কোন বানর (ape) কে মানুষ হতে দেখেছেন। তাঁর এই যুক্তির মধ্যে বেঠিক বিষয়টি কী?"

এতদসত্ত্বেও মন্ত্রীমহাশয় যে দমে যাননি তা পুনর্বার ৩০শে জুন করা পূর্বোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। আসলে এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচার দ্বারা জনগণের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করার সাথে সাথে ঐ 'আমরা শ্রেষ্ঠ আমাদের অতীত শ্রেষ্ঠ' প্রচারের মাধ্যমে উগ্র ধর্মান্ধতা আর জাতিদম্ভ প্রচার করা উদ্দেশ্য। তাই এটা চলতেই থাকবে।■

স্মরণ

স্টিফেন হকিং ঃ জীবন ও কৃতি

[রচনাটি ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র অন্বেষণে পত্রিকা জুলাই, ২০১৮ সংখ্যা থেকে পুণর্মুদ্রণ করা হল – সম্পাদক]

যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন 'মহাবিশ্ব বিজ্ঞানের নিয়মগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে' (The Gurdian পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে) এবং এতে ঈশ্বরের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন স্থান নেই, যিনি বলেছিলেন 'আমার মতে সবচেয়ে সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই, এই মহাবিশ্ব কোনো একজন সৃষ্টি করেনি এবং কেউ একজন আমাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে না' (ডিসকভারি চ্যানেলের 'কিউরিওসিটি' টেলিভিশন সিরিয়েলের প্রথম পর্ব) – সেই **স্টিফেন উইলিয়ম হকিং** আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর জীবনাবসান হয়েছে ১৪ই মার্চ ২০১৮। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের অনুসন্ধানকারী প্রত্যেক বিজ্ঞানীই যদিও নিজ বাস্তব কার্যক্ষেত্রে অলৌকিক বিশ্বাস বা ঐশ্বরিক ইচ্ছার মোহ দ্বারা পরিচালিত হন না, তবু বিজ্ঞানী মহলের একটা বড় অংশ প্রাধান্যকারী সমাজ প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে অলৌকিকতাবাদ তথা ঈশ্বরবাদের সঙ্গে দর্শনগত ভাবে আপোষ করে থাকেন অথবা এক অদ্ভূত স্ববিরোধিতার জালে জীবনভর জড়িয়ে থাকেন। এই দিক থেকে স্টিফেন হকিং ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত হকিং তার এই অবস্থানে অনড় ছিলেন।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের ৮ই জানুয়ারী, ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড শহরে এক উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে জন্ম নেয়া হকিং-এর শিক্ষাক্ষেত্রের শীর্ষে পৌঁছানো নির্ধারিতই ছিল। বাবার ইচ্ছা ছিল স্টিফেন হকিং তার মতো চিকিৎসা গবেষণায় নিয়োজিত হবেন, কিন্তু যুক্তির (Reason) প্রতি আকর্ষণ এবং মহাকাশের রহস্যময়তার গভীরে লুকোনো নিয়মের টান তাকে গণিত এবং মহাকাশ বিজ্ঞানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র হিসেবে হকিং ছিলেন একেবারেই মাঝারী মানের। গদ বাঁধা অ্যাকাডেমিক কাজ তাকে মোটেই আকর্ষণ করতো না। তার নিজের ভাষায় কাজগুলি ছিল একেবারেই হাস্যকর রকমের সোজা (Rediculously Easy)। অক্সফোর্ডে প্রকৃতি বিজ্ঞানের (Natural Science) বি. এ অনার্স কোর্সে তার শিক্ষক রবার্ট বারমেন, তার সম্পর্কে বলেন 'শুধু এটা জানাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কোনো কাজ করা যায় কিনা, অন্য ছাত্ররা কিভাবে সেটা করছে তা তিনি দেখতেই চাইতেন না।' আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে হকিং তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা (Theoretical Physics) কে বেছে নিয়ে ছিলেন – কারণ কোর্স অধ্যয়নের জন্য তার কাছে সময় কম ছিল, যা পদার্থবিদ্যার অন্য শাখাগুলি, যেগুলিতে প্রচুর পরীক্ষালব্ধ তথ্যের আহরণ করতে হয়, অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে প্রকৃতির বস্তুসমষ্টি এবং ব্যবস্থাকে (Physical objects and systems) বিমূর্ত করে, গাণিতিক মডেলে প্রতিস্থাপিত করে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা ও পূর্বানুমান করার প্রয়াস করা হয় (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)। অন্যদিকে এর বিপরীতে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা (Experimental Physics) প্রাকৃতিক ঘনটাবলীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনাবলীর কারণ নির্ণয় করে। বৈজ্ঞানি প্রকল্প ও অনুমানগুলির সত্যতা প্রমান করে। বিপরীত হলেও এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরকে পথ দেখায়।

হকিং এর কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল, বি. এ-তে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া। যেটা করতে না পারলে তিনি কেম্ব্রিজে মহাকাশ বিজ্ঞান (Astronomy/Cosmology) নিয়ে গবেষণা করতে পারবেন না। কোনোক্রমে তা সম্পন্ন করার পর তিনি মহাকাশ গবেষণার জগতে প্রবেশ করলেন।

ঠিক এই সময় এক বিরাট বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। অক্সফোর্ডে পড়ার সময়ই তিনি দেখলেন তার চলাফেরায় অসুবিধা হচ্ছে এবং ঘন ঘন পড়ে যাচ্ছেন। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা বললেন অতি বিরল এক স্নায়ুতন্ত্রের রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। এর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কার হয় নি এবং আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। এই ঘটনায় তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি 'My experience with ALS' (ALS বা অ্যামাইলট্রফিক ল্যাটারেল স্ক্লোরোসিস এমন একটি রোগ যাতে মোটর স্নায়ুর কার্যকারিতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গিয়ে, আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি নাড়াতে পারেন না।) প্রবন্ধে লিখেছেন 'যখন বুঝতে পারলাম আমি দুরারোগ্য একটি রোগে আক্রান্ত হয়েছি এবং কয়েক বছরের মধ্যে মারা যাব, তখন একটা বড় ধাক্কা খেলাম। যাইহোক হাসপাতালে আমার বেডের পাশে আমার স্বল্প পরিচিত একটি ছেলে লিউকোমিয়া রোগে মারা গেল। সে দিকে তাকানো খুব সুখকর নয়। স্পষ্টই বুঝলাম আমার থেকেও অনেকে আরো খারাপ অবস্থায় আছে। যখনই আমার মন খারাপ হয়ে যেত তখনই আমি ছেলেটির কথা মনে করতাম। ... চিকিৎসকরা আমাকে কেম্ব্রিজে গবেষণায় ফিরে যেতে বললেন। আমি আপেক্ষিকতা ও মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমার অঙ্কের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না এবং যাইহোক আমি তো পি. এইচ. ডি শেষ করা

পর্যন্ত বেচে থাকব না।'

এই রকম অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হকিং সেই হকিং হন যাকে গোটা বিশ্ব জানে। মনে রাখতে হবে হকিং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতটা নড়া চড়া করতে পারতেন তা ও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে এবং উনিশো পঁচাশি সালে নিউমোনিয়া আক্রান্ত হবার পর, চিকিৎসা করতে গিয়ে তার বাক্ শক্তি চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শুধু তার একটি আঙ্গুল নাড়াতে পারতেন। তাই গোটা পৃথিবী হকিংকে 'হুইল চেয়ারে' বসা বিজ্ঞানী হিসেবেই দেখেছে। কিন্তু তার শারীরিক অক্ষমতার দিকে নজর রেখে তৈরী করা কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর ভর করে হকিং জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তার তত্ত্ব ও মতামতকে জনসমক্ষে রেখে গেছেন। পঙ্গু ও চলৎ শক্তি হীন অবস্থায় অনুসন্ধানী এবং বিশ্লেষক মন নিয়ে হকিং তার মৌলিক গবেষণাগুলির পুরোটাই করেছেন এবং এই জন্যেও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

যাইহোক, হকিং যখন মহাকাশ গবেষণার দ্বার প্রান্তে পা রাখলেন, তখন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের উৎপত্তির বিষয়ে স্পষ্ট দু'টি মতবাদিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছেন। মনে রাখতে হবে, তত দিনে বিজ্ঞানী এডুইন হাব্‌লের পরীক্ষালব্ধ প্রমান থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে মহাবিশ্ব ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। মহাকাশের দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কগুলি ক্রমাগত পরস্পর থেকে দূরে যাচ্ছে। কিন্তু স্থির অচল বিশ্বের পূর্বপ্রচলিত ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানীদের একাংশ মহাবিশ্বের সৃষ্টি সংক্রান্ত 'ষ্টেডি ষ্টেট মডেলের' অবতারণা করেন। এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রেড হয়েল, হের্মান বন্ডি এবং থমাস গোল্ড প্রমুখ ছিলেন। এই তত্ত্বে perfect cosmological [অর্থাৎ যে তত্ত্বে বলা হয় দেশ অথবা স্থান (space) এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ গোচর মহাবিশ্ব একই রকম আছে] এর সঙ্গে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের প্রমাণকে খাপ খাইয়ে নেয়া হয়। বলা হয় মহাবিশ্ব সম্প্রাসরণশীল হলেও অনবরত পদার্থের সৃষ্টির কারণে তার ঘনত্ব একই থাকছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা বিলয় বলে কোন কিছুই নেই। জানা যায়, 'আইনস্টাইন' প্রথমে এই প্রকল্প উপস্থাপন করে ও পরে তা খণ্ডন করেছিলেন।

স্থিতিশীলতার এই তত্ত্বকে সরাসরি খণ্ডন করে আধুনিক বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এতে বলা হয় অতীতে এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে (বর্তমানে যার অনুমান ১৩.৮ ± .০২ বিলিয়ন বছর। এক বিলিয়ন = একশ কোটি) এক অসীম ঘনত্ব ও তাপমাত্রার অবস্থা থেকে মহাবিশ্বের দেশ অথবা স্থান ও কাল উৎপন্ন হয়ে ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে, বর্তমান অবস্থায় এসেছে এবং আগামীতেও তা জারী থাকবে। এই সময়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ক্রমাগত কমেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে একের পর এক সাব অ্যাটমিক কণা, পরমাণু এবং আদি মৌলকণাগুলি সৃষ্টি হয়ে, মহাকর্ষের বন্ধনে জুড়ে গিয়ে 'ডার্ক ম্যাটার' ও পরবর্তীতে নক্ষত্র ও তারকাপুঞ্জ সৃষ্টি করেছে। উৎপত্তি থেকে মহাবিশ্বের ক্রম বিকাশের এই তত্ত্ব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যগুলির সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা দিয়ে স্টেডি স্টেট তত্ত্বকে খারিজ করে। কিন্তু একই সঙ্গে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সময়কার অতি উচ্চ তাপমাত্রা ও ঘনত্বের পরিস্থিতিতে পদার্থবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত সূত্রগুলির কার্যকারীতা সম্পর্কে নতুন চ্যালেঞ্জ পেশ করে।

এই সময় গবেষণার জগতে প্রবেশ করে হকিং বিগ ব্যাং তত্ত্বের দৃঢ় সমর্থক বনে যান। বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের দ্বারা পেশ করা বক্তব্যে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বর হচ্ছে দেশ (ব্ল্যাক হোল বা space) ও কালের এমন একটি স্থিতি যা মহাকর্ষ বলের এতটাই প্রাবল্য দর্শায়, যার ক্রিয়ায় কোনো কিছুই, এমন কি কোনো কণা এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ যেমন আলো এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দেখায় যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত ভর থাকলে তা দেশ (ব্ল্যাক হোল বা space) কালকে এতটা বক্রতা (deform) দিতে পারে যাতে কৃষ্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়-এর কেন্দ্রে দেশ ও কালের এককত্বের(Space time singularities) সূত্রটি তিনি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পেনরোজের সঙ্গে যৌথ ভাবে হকিং দেখান আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুযায়ী দেশ ও কালের সূত্রপাত মহাবিস্ফোরণে এবং তার সমাপ্তি কৃষ্ণগহ্বরে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেহেতু সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে ভেঙ্গে পড়ে, তাই সাধারণ আপেক্ষিকতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর আরেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব-কোয়ান্টামের মেল বন্ধন প্রয়োজন। এই দু'টি তত্ত্বের মধ্যে, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব-অতি বৃহৎ দূরত্ব ও ভরের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বলের দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলগুলির সামঞ্জস্য সুব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। অন্যদিকে কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্ব ক্ষুদ্র দূরত্ব ও ভরের জগতের (যেমন পরমাণুর অভ্যন্তরে) ঘটনাবলী, স্থির তড়িৎ বল, দুর্বল ও শক্তিশালী (Electro static, Weak and strong force) বলের দ্বারা যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই দুটি তত্ত্ব পরস্পরের ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অসমর্থ। পদার্থবিদ্যার এই দুরূহ সমস্যার সমাধান এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয় নি এবং বিজ্ঞানীদের প্রয়াস বর্তমানেও জারী আছে। দু'টি তত্ত্বের সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত থেকে হকিং প্রতিষ্ঠা করেন, ব্ল্যাক হোল পুরোপুরি ব্ল্যাক নয় অর্থাৎ এর থেকেও বিকিরণ বের হয়। (এর নাম দেওয়া হয় 'হকিং বিকিরণ') এবং এর ফলে ব্ল্যাক হোল শক্তি নির্গমন করতে করতে বিলীন হয়ে যাবে (১৯৭৪)। এই তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে হকিং আরেকটি (conjecture) করেন, যেটি হল, কালের প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হকিং কৃষ্ণগহ্বর তথ্য ধাঁধাঁ (Blackhole information paradox) বিষয়ে গবেষণারত

ছিলেন।

[www. Hawking.org.uk থেকে সচ্ছন্দ অনুবাদ করা হয়েছে। বন্ধনীর মধ্যেকার শব্দাবলী আমাদের –সম্পাদক মন্ডলী, অন্বেষণে]

হকিং প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলির মধ্যে ‘দ্য লার্জ স্কেল স্ট্রাক্চার অফ স্পেস টাইম (জে. এফ. আর এলিসের সঙ্গে যৌথভাবে), ‘জেনারেল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি ঃ এন আইনস্টাইন সেন্টেনারী সার্ভে’ (ডব্লিউ. ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে), ‘থ্রি হান্ডেড ইয়ারস অব গ্র্যাভিটেশন (যৌথভাবে)’ ‘প্রোপার্টিস অফ এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশির ভাগ জীবদ্দশায় তো বটেই এমনকি মৃত্যুর পরেও লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যান। এদের মধ্যে এমন বিজ্ঞানীগণও আছেন যাদের নিরলস সাধনার ফলে মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে উল্লম্ফনকারী অগ্রগতি ঘটেছে। হকিং এর মতো যারা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার মতো বিষয়ে গবেষণা করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি খাটে। হকিং কি করে ব্যতিক্রম হয়ে উঠলেন তা অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার মধ্য দিয়ে হকিং এর প্রাথমিক পরিচিতির সূত্রপাত হয়। ১৯৮৮ সালে তার লেখা বই ‘এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম ঃ ফ্রম বিগ ব্যাং টু ব্ল্যাক হোল’ প্রকাশিত হলে তা বিজ্ঞান বইয়ের সাধারণ পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়। প্রকাশের ৫ বছর পর্যন্ত এই বই সানডে টাইমস’এর সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ছিল। বিগত সময়ে তা এক কোটি বিক্রি হয়েছে এবং ৩৫টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এই বই এর বাণিজ্যিক সাফল্যের ফলে প্রকাশক, দূরদর্শন ও সিনেমা প্রযোজকরা হকিংকে ‘সেলিব্রিটি’ হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু করে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ‘ব্ল্যাক হোল এণ্ড বেবী ইউনিভার্সেস এণ্ড আদার এসেস’ বইতে তিনি লিখেছেন ‘আমার আংশিক লক্ষ্য ছিল টাকা রোজগার। যা দিয়ে আমি আমার মেয়ের স্কুলের ফি দিতে পারি। ... কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল মহাবিশ্বের সম্বন্ধে আমরা কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছি তা জানানো। কিভাবে আমরা মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যেকার সমস্ত বস্তুকে ব্যাখ্যা করার মতো একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছেছি তা উপস্থাপন করা...’ এই বইয়ের অন্যত্র তিনি লিখেছেন ‘... যদি আমরা মেনে নিই আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা দুনিয়ার পরিবর্তনকে বন্ধ করতে পারব না। তবে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যাতে পরিবর্তনগুলি সঠিক দিশায় যায়। গণতান্ত্রিক সমাজে এর মানে দাঁড়ায় জনসাধারণের বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, যাতে তারা সচেতন ভাবে সরকারের নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে সেই ভার ছেড়ে না দেয়।” কিন্তু তার উদ্দেশ্য যাই থাকুক এই সময় থেকে তার লেখালেখি এবং সম্প্রচারে প্রকাশক ও প্রয়োজকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ অনিবার্যভাবেই প্রভাব খাটাতে থাকে।

এরপর থেকে হকিং এর লেখা (অথবা সহ লেখকদের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা) উল্লেখ যোগ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই গুলি হল ‘উইনিভার্স ইন এ নাট শেল’, ‘দ্য গ্র্যাণ্ড ডিজাইন’, ‘ব্রীফার হিষ্ট্রী অফ টাইম’, ‘গড ক্রিয়েটেড ইন্টিজার’ ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেকটি বই তুমুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বাজারি সাফল্য লাভ করে। কিন্তু বাজারের তাড়নায় তার লেখাগুলি বার বার পরিবর্তন করা হতে থাকে। একই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত জীবন প্রচার মাধ্যমের মারফৎ জনসমক্ষে এনে তাকে জীবন্ত কিংবদন্তী বানিয়ে তোলা হয়। তিনি নিজেই এর বিরোধিতা করেন। এছাড়া যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খন্ডন করেছেন, তার বক্তব্যকে এমন ভাবে তুলে ধরা হয় যাতে স্পষ্টতার থেকে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় বেশি। যেমন তার ব্যবহৃত শব্দবন্ধ ‘ঈশ্বরের মনের কথা’ (Mind of God) ধোঁয়াশা সৃষ্টি করায় তিনি তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান জানার আগে আমাদের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান এক অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়। ‘আমরা ঈশ্বরের মনকে জানতে পারব’ বলতে আমি বুঝিয়েছি, ঈশ্বর যদি থাকত, যদিও নেই, তাহলে ঈশ্বর যতটা জানত, আমরা ঠিক ততটা জানব। আমি নিরীশ্বরবাদী’। (সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে ‘এল মুন্ডে’ এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।) যার মত এরকম সেই বৈজ্ঞানিকের সর্বশেষ বইয়ের নামকরণ ‘দ্য গড ক্রিয়েটেড ইন্টিজার’, (সংখ্যা ঈশ্বরের সৃষ্টি) এর মধ্যে একই বাজারী স্বার্থের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। হকিংকে ‘সেলিব্রিটি’ হিসেবে উপস্থাপনের বিরোধিতা করতে দেখা যায় খোদ বিজ্ঞানী মহল থেকেই। হিগ্‌স বোসন কণার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ‘লার্জ হেড্রন কোলাইডার’ পরীক্ষাকালে হকিং জোর দিয়ে বলেন, বোসনের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্ভব নয়। এই সময়কার বাদানুবাদে বিজ্ঞানী পিটার হিগ্‌স ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, যে ‘হকিং যেহেতু সেলিব্রিটি হয়ে গেছেন ফলে তিনি যা বলেন লোকে তাই বিশ্বাস করে।’

বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় হ্রাসের বিরুদ্ধে হকিং সরব ছিলেন এবং এই কারণে ব্রিটিশ সরকারের দেয়া ‘নাইট’ উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে দাঁড়ান। দুনিয়া জুড়ে ‘সর্বজনীন স্বাস্থ্য’ পরিষেবার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলেন, বহু জাতিক কোম্পানিগুলি মুনাফার স্বার্থে ব্যাপক মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করছে।

যাই হোক, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হকিং-এর মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আগামী বহুকাল ধরে পরীক্ষা-মূলক পদার্থবিজ্ঞানীগণ প্রমাণের কষ্টি পাথরে যাচাই করতে থাকবেন। ■

প্রবন্ধ ঃ

কৃষির অভাবনীয় উন্নতি কৃষকদের জীবনে উন্নতি ঘটিয়েছে কী?

আমরা সকলেই জানি আদিম মানুষ একসময় বন্য অবস্থায় ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, অর্থাৎ যে যুগের কোন লিখিত ইতিহাস নেই বন্যাবস্থা থেকে তথাকথিত সভ্য সমাজে বির্বতনের পর্যায়ে একটা সময় মানুষ কৃষির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছিল। নৃতত্ত্ববিদ এবং নৃকুলবিদরা গবেষনা করে এই তথ্য জেনেছেন। এই কৃষি কাজ, অর্থাৎ বীজ থেকে গাছ জন্ম দিয়ে ফসল উৎপাদন সেযুগের মানুষের জীবনে একটা বিরাট পরির্তন এনেছিল। এর ফলে যাযাবর জীবনের বদলে স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠতে থাকে প্রাথমিকভাবে নদীর দুইপাড়ে এবং সমুদ্র উপকূলে। শুরু হল আহরণের বদলে উৎপাদন। মানব সমাজের সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমাজের ধারাবাহিক বিকাশ সৃষ্টে এটা বলাই যায় যে, মানব সমাজের বিকাশ হলো আসলে উৎপাদন ব্যবস্থারই বিকাশ। প্রথমে আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজের মধ্যে কৃষির যতটুকু বিকাশ হয়েছিল তাতে অভাব পূরণ হয় নি ঠিকই তবে তা সমাজের সকলের জন্য হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা সমাজকে দুটি বিপরীত শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উৎপাদনের উন্নতি উৎপাদনের মালিক শ্রেণীর উন্নতি ঘটালেও মালিকানাহীন অথচ প্রত্যক্ষ উৎপাদক শ্রেণীর জীবনে বিশেষ কোন উন্নতি ঘটায় নি। এটা যেমন দাস সমাজ, সামন্ত সমাজের ক্ষেত্রে সত্যি তেমননি তা আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রেও সত্যি। দাসযুগে কৃষির উন্নতির ক্ষেত্রে কৃষি সরঞ্জামের উন্নতি ই প্রধান ছিল। সামন্ত-যুগে কৃষি সরঞ্জামের উন্নতির পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার, সারের ব্যবহার এবং উইন্ডমিল, ওয়াটার মিল তৈরি এবং বীজ নিয়ে গবেষনার সূচনা হয়। তবে দাসযুগে এবং সামন্ত-যুগে কৃষি ছিল প্রকৃতি নির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট বা অজন্মাই ছিল প্রধান বিষয়। দুর্ভিক্ষ তাই লেগেই থাকত। ইয়োরোপে পুঁজিবাদের সূচনা (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বত্র তার বিস্তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা কৃষির বিপুল উন্নতি ঘটিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তার বিকাশ হয়েছে উচ্চমাত্রায়।

এখন আমাদের দেশের কথায় আসা যাক। ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকে কৃষি উৎপাদন হয়ে আসছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, অন্ততঃ ১০ হাজার বছর আগে ভারতে কৃষি উৎপাদন শুরু হয়েছিল। সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার উচ্চ পর্যায়ে, অর্থাৎ যখন সামন্ত ব্যবস্থার গর্ভে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভ্রূণ বিকশিত হচ্ছে, সেই সময় ভারত পশ্চিম ইউরোপীয় (মুখ্যত ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যবাদের অধীন হয়। প্রায় দু'শো বছরের শাসনকালে (প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী) ব্রিটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করেছে। গ্রামাঞ্চলে পুরানো সামন্তব্যবস্থাকে আইন করে টিকিয়ে রেখেছে। বহু ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বাভাবিক বিকাশের গতি বলপূর্বক অবরুদ্ধ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে এদেশে তারা শিল্পের বিকাশ ঘটালেও কৃষির বিকাশ ছিল অতিমন্থর। কিন্তু বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায় ধীর গতিতে হলেও বাজারমুখী উৎপাদনের বিকাশ শুরু হয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরাট উন্নতির প্রভাব কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পড়তে শুরু করে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশাল উন্নতি বিকশিত রাষ্ট্রে কৃষির যে বিশাল উন্নতি ঘটিয়েছিল তার তুলনায় এদেশের কৃষি ছিল প্রাচীন, প্রকৃতি নির্ভর।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অধীন হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জৈবসারের পাশাপাশি অজৈব (যাকে চলতি কথায় রাসায়নিক সার বলা হয়) সার, কীটনাশক, উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। এর ধারাবাহিকতা আজও বজায় আছে। এখন চর্তুদিকে তাকালে দেখা যায় কৃষি ক্ষেত্রে লাঙল-বলদের ব্যবহার ক্রমহ্রাসমান। দেশের অধিকাংশ জমিতে হস্তচালিত বা মোটর চালিত ট্রাক্টর ব্যবহার হচ্ছে। উচ্চফলনশীল বীজ প্রায় সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে। জিন পরিবর্তিত বীজ এর ব্যবহার শুরু হয়েছে যদিও তার ব্যবহার ক্ষতিকারক এই অভিযোগ তুলে একাংশ বিজ্ঞানী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিরোধিতা করছেন। মাটি পরীক্ষা করে সার প্রয়োগের বহু কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। কৃষকেরা অধিকাংশ

সময় মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা না করেই তার বহুল ব্যবহার করছেন। পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য বহু কীটনাশক বাজারে এসেছে, যার ব্যবহার কৃষকেরা বহুল পরিমাণে করে চলেছেন। ভারতে বর্তমানে কৃষি জমির পরিমাণ ১৯৫ মিলিয়ন হেক্টর (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ, ১ হেক্টর = ৭.৪৭ বিঘা)। এর মধ্যে এখন ৬৩% জমিতে বা ১২৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বৃষ্টির জলে প্রধানভাবে চাষ হয় আর ৭০ মিলিয়ন হেক্টর বা ৩৭% জমি সেচ সেবিত। সেচ ব্যবস্থার নানা প্রকার উন্নতির প্রয়াস চলছে। নদীর জল খাল খনন করে, জলাশয়ে বৃষ্টির জল ধরে রেখে, পাম্পের সাহায্যে মাটির নীচের জল তুলে তা ব্যবহার হচ্ছে। সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে সেই জলে সেচ আরব দুনিয়া এবং অন্যত্র হলেও এদেশে এর সূচনা হয় নি। আবহাওয়া বিজ্ঞানের গবেষণায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা, ঝড়ের পূর্বাভাস আগের চাইতে অনেক সঠিকভাবে দেওয়ায় এদেশের কৃষকদের একটা অংশ উপকৃত হচ্ছেন। এমন কী উন্নত দুনিয়ায় বায়ুমন্ডলে সিলভার আয়োডাইড, পটাশিয়াম ও সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি রাসায়নিক ছিটিয়ে কৃত্রিম বৃষ্টি আনার প্রযুক্তি চালু হলেও এদেশে সেভাবে তার ব্যবহার হয় নি। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার চালকবিহীন ট্রাক্টর, ফসল কাটার এবং ফসল বোনার মেশিনের ব্যবহার শুরু হলে কৃষিতে উৎপাদনের মাত্রা বর্তমানের তুলনায় আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কৃষি জমির স্বল্পতার কারণে এখন বাড়ির ছাদে, দেওয়ালে, মাচায় ফসল ফলানোর প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জমিতেও কৃষি উৎপাদনের প্রযুক্তি আবিস্কৃত। এইসব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি লাগু করা সম্ভব বড় বড় কৃষি ফার্মে যার সংখ্যা এদেশে এখনও নগণ্য। এদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে চাষ কৃষির বিকাশের পথে বাধা। তবুও এদেশের স্বাভাবিক ভূ-প্রকৃতি, মাটি, জলবায়ু কৃষি উৎপাদনে এতটাই উপযোগী যে আধুনিক প্রযুক্তির সার্বিক ব্যবহার ছাড়াই এদেশে কৃষির বিকাশ বিরাট আকারে হয়েছে শ্রমজীবী জনতার অক্লান্ত পরিশ্রমে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই প্রয়োগের ফলাফল কি ঘটেছে আসুন এখন তা বিচার করা যাক। বর্তমান ভারতে কৃষি জমির পরিমাণ ১৯৫ মিলিয়ন হেক্টর, এছাড়া রয়েছে ৬৫ মিলিয়ন হেক্টর জমির জঙ্গল। এই জঙ্গলেও নানান প্রজাতির দামি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভারত দুগ্ধ উৎপাদনে, ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদনে এবং খাদ্যের নানা মশলা উৎপাদনে, চা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থানে আছে। ধান, গম, তুলা, আখ, মৎস চাষ, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পালন, ফল, সবজি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে আছে। বিশ্বের ১০% ফল ভারতেই উৎপন্ন হয়। কফি উৎপাদনে ভারত বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানে। ১৯৫০-৫১ সালে দেশের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ধান উৎপাদনে ছিল ৩০.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ২০.৫৮ মিলিয়ন টন, প্রতি হেক্টরে ৬৬৮ কি. গ্রা. হিসাবে। আর ১৯৯৯-২০০০ সালে ৪৪.৯৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেই উৎপাদন ৪ গুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯.৪৮ মিলিয়ন টনে, প্রতি হেক্টরে ১৯৯০ কেজি হিসাবে। ২০১০-১১ সালের হিসাবে (১৯৯০-২০০০ সালের সমপরিমাণ জমিতে) ধান উৎপাদন হয়েছে ১০৪.৩২ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ বিগত ৬০ বছরে উৎপাদন বেড়েছে ৫ গুণের বেশি। বর্তমানে বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালের প্রায় ৩৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য ফসলের হিসাব নিলে প্রায় সবক্ষেত্রেই কমবেশি একই ছবি দেখা যাবে।

কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য কৃষকের কাছে আর্শীবাদ হয়ে উঠছে না কেন? প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট বা অজন্মা হলে কৃষক আগেও মরত এখনও মরে। কিন্তু **মাঠ ভরা ফসল ফলিয়েও পেটে নাই দানা**! এই ছবির কারণ কী? প্রতিদিন দেনার দায়ে ভিটে-মাটি হারিয়ে সর্বশান্ত কৃষকের মৃত্যু মিছিল প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে কেন? সরকারি তথ্য বলছে দেশে প্রতিদিন ৩৫ জন কৃষক আত্মহত্যার শিকার হচ্ছেন। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এত বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও কৃষকদের এই পরিণতি কেন?

এটা জানতে আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলাম। আমন ধান চাষ করতে গড়ে বিঘাপ্রতি কৃষকদের খরচ হয় ৪২০০ টাকা, পারিবারিক শ্রম এবং ঋণের সুদ বাদ দিয়ে। গড়ে এই ফসল বিক্রি করে কৃষক পায় ৬০০০ টাকা। অর্থাৎ ৬ মাস ধরে চাষ করে কৃষকের গড় আয় ১৮০০ টাকা। পারিবারিক শ্রমের মজুরি ধরলে কৃষকের আসলে লোকসান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তো কথাই নেই। বোরো ধান চাষ প্রতি বিঘায় করতে কৃষকদের খরচ পারিবারিক শ্রম এবং ঋণের সুদ বাদ দিলে গড়ে ৮২০০ টাকা। আর এই ফসল বেচে আয় হয় গড়ে ৯৭০০ টাকা। অর্থাৎ ৪ মাস ধরে চাষ করে কৃষকের লাভ হয় গড়ে বিঘা প্রতি ১৫০০ টাকা। এক্ষেত্রেও পারিবারিক শ্রমের মজুরি ধরলে কৃষকের আসলে লোকসান। বর্তমানে কৃষকরা বাজারজাত করার লক্ষ্য নিয়ে ফুল, ফল, মসলা, ভুট্টা, পাট, আখ, বরার, উত্তরবঙ্গে তামাক,

চা ইত্যাদি নানা চাষে নেমেছেন। মৎস চাষ, হাঁস-মুরগীর পোল্ট্রি, গরু-ভেড়া- শূকর পালন, প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিকাজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে। সবক্ষেত্রেই খুঁটিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় কৃষকের লাভ নেই। তাই তো দেখা যায় বাজারে দাম না পেয়ে কৃষকেরা রাস্তায়-হাটে বা মাঠে ফসল ফেলে গরুকে খাওয়াচ্ছেন, ক্ষেতে আগুন দিচ্ছেন এবং দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করছেন।

ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিসের ৭০তম সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে দেশে ক্ষেত মজুর ১১.২৪%। প্রান্তিক চাষী – যাদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ (০.০১-০.০৯ একর) – ৪০.১১%, উপ-প্রান্তিক (১.০-২.৪৯ একর) – ২০.৫২%, ক্ষুদ্র জোতের মালিক (২.৫০-৪.৯৯ একর) – ১৩.৪২%, মাঝারি জোতের মালিক (৫.০০-১৪.৯৯ একর) – ১২.০৯%, বড় জোতের মালিক (১৫+একর) – ২.৬২% (১ হেক্টর = ৭.৪৭ বিঘা)। এদের মধ্যে উপপ্রান্তিক, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র জোতের মালিকরা ব্যাঙ্ক ঋণের সুযোগ পান না। বেশিরভাগই গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ করে এবং দোকান থেকে সার, বীজ, কীটনাশক ধার করে মুখ্যত পারিবারিক শ্রমে চাষ করে। কিন্তু মাঝারি জোত ও বড় জোতের মালিকরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়। এরা হল গ্রামীণ পাতি বুর্জোয়া কৃষক এবং গ্রামীণ বুর্জোয়া। এই পাতি বুর্জোয়া কৃষকেরা পারিবারিক শ্রমের পাশাপাশি চাষের কাজে মজুর লাগায়। আর গ্রামীণ বুর্জোয়ারা মজুর দিয়ে চাষ করায়। এই পাতি বুর্জোয়া কৃষকদের উচ্চস্তর এবং গ্রামীণ বুর্জোয়ারা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে ফসল বাজারজাত করার জন্য। তারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করে। কিন্তু সার, বীজ, কীটনাশক, ডিজেল, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খরচ একদিকে প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকায় অন্যদিকে তুলনায় ফসলের পাইকারি বাজারদর কম হওয়ায় এরা ধারাবাহিক লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। কৃষকেরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নির্দ্ধারণ করতে পারেন না। আমরা জানি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চাহিদা ও যোগানের নিয়মেই পণ্যের দাম বাজারে নির্দ্ধারিত হয়। বড় বড় পাইকার এবং ব্যবসায়ীরা কৃত্রিমভাবে চাহিদাকে কমিয়ে রাখে। জোটবদ্ধ পাইকাররা কৃষকদের থেকে ফসল কেনার সময় বাজার দর কমিয়ে রাখে। ঋণ পরিশোধ করার তাগিদে, অলাভজনক দামেই কৃষকেরা তাই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন। চালু ভাষায় একেই বলে অভাবী বিক্রি। পরে পাইকার ও ব্যবসায়ীরা সেই ফসল উপভোক্তা বাজারে চার-পাঁচগুণ দামে তা বিক্রি করে। কৃষকেরা ঋণ নিয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে উৎপাদন করেন আর তার লাভ ওঠায় বড় পাইকার-ব্যবসায়ীরা। তাই সমাজে দাবি উঠেছে 'সরকারকে ফসলের লাভ জনক দাম ধার্য করে দিতে হবে।' তা সম্ভবপর না হওয়ায় দাবি উঠছে 'সরকার লাভজনক দামে ফসল কিনুক'। দাবি ওঠে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price) বা MSP নির্ধারণ করে দিতে হবে। সরকার ধনী কৃষক বা গ্রামীণ বুর্জোয়াদের দাবি মেনে প্রথমে ধান এবং গম এবং বর্তমানে ১৪টি কৃষিপণ্য কেনা শুরু করে, যদিও তা যথেষ্ট লাভজনক দামে নয়। তাছাড়া সরকারের প্রয়োজন যতটুকু ততটুকুই কেনে, তার অতিরিক্ত নয়। ফলে কৃষকদের সমস্যার কোন সমাধান হয় না। ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে তারা জমি হারান। তাদের ঘরে অত্যাধুনিক কৃষি সরঞ্জাম পরে থাকে আর বন্দকী জমি চলে যায় গ্রামীণ মহাজন বা সরকারি-বেসরকারি মহাজন – ব্যাঙ্কের ঘরে। সর্বশান্ত কৃষকেরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। হার না মানা কৃষকেরা আবার রাজপথ মুখরিত করে দাবি তোলেন 'কৃষি ঋণ মুকুব কর'। ২০০৯ সালে কেন্দ্র সরকার ৭১,৬৮০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ মুকুব করেছিল। তাতেও সমস্যার সমাধান হয় নি। কয়েক বছর অন্তর আবার সেই দাবি 'সমস্ত কৃষি ঋণ মুকুব কর' আওয়াজ ওঠে। আওয়াজ ওঠে 'লাভজনক দামে সমস্ত ফসল কিনতে হবে।'

কিন্তু পুঁজিবাদী সরকারের পক্ষে এই দাবি মানা আদৌ সম্ভব নয়। কেননা বছর বছর কৃষি ঋণ মুকুব করলে সরকারের ভাঁড়ার শূন্য হবে। আবার পাইকার-ব্যবসায়ীদের লাভজনক দামে ফসল কেনাতে বাধ্য করতেও সরকার অপারগ। কারণ পুঁজিবাদী সরকার তার শ্রেণীর বিরুদ্ধে যেতে পারে না। সরকার সমস্ত ফসল লাভজনক দামে কিনতেও অক্ষম। কেননা তাতে পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতি সংকটের মুখে পরে যায়। আসলে কৃষকদের পক্ষ থেকে বর্তমানে যে দাবি উঠছে তার মর্মবস্তু হচ্ছে সমাজবাদী বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আওয়াজ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজবাদী বন্টন কাল্পনিক, অসম্ভব। আর তাই বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকের অবনতি প্রতিহত করা অসম্ভব। ■

প্রবন্ধ ঃ

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমজীবী মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বস্তুবাদের অনুশীলন করেন

এদেশের তথা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য খেটেখাওয়া মানুষ স্কুলের গন্ডী পার করার আগেই খেটেখাওয়ার লড়াই-এ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যারা সেই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত দলের মানুষ তারা স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান পড়েনি, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানে না। তাদের জানা নেই পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য বা আকাশের গ্রহ তারা সৃষ্টির বিজ্ঞান। তাঁদের জানা নেই সূর্য-গ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, জোয়ার-ভাঁটা কেন হয়? তারা জানেন না বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ভূমিকম্প অগ্নুৎপাতের কারণ। তাদের জানা নেই পশু-পাখি-গাছপালা এবং মানুষ কিভাবে সৃষ্টি হল। মানুষ কি গোড়া থেকে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান বা উঁচুজাত-নীচুজাতে বিভক্ত ছিল? মানব সমাজে ধনী-দরিদ্র কি প্রথম থেকেই ছিল? এমন হাজারো প্রশ্নের কোন সঠিক-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই। মঠ-মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় সাধু-সন্ত-ব্রাহ্মণ-মৌলবীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেন। বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকেও এসব গল্প তারা শোনেন। আজকাল রেডিও-টিভি-সিরিয়ালেও অনেক কিছু শেখায়। এসব শুনে মানুষের ধন্দ কিন্তু কাটে না, বরং তা অনেক সময় বেড়েই যায়। তবে শ্রমজীবী মানুষ সংসারের প্রতিদিনকার অশান্তি, রোজগার নিয়ে দুশ্চিন্তায় এসব নিয়ে বেশিদূর ভেবে উঠতে পারেন না। কথায় বলে **"যার পেটে নেই ভাত/তার আবার জানবার সাধ।"** তাই অজ্ঞতাকে ভবিতব্য ধরে নিয়ে চলেন অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ। দিশেহারা বিপর্যস্ত মানুষকে অবুঝ দিয়ে সমাজপতিরা বলেন **"চলবে কিসে, ভাবছ মিছে/ভাববার তুমি কে?/ যার ভাবনার তিনি ভাববেন/ভাব তুমি তাকে।"** অথবা **"যে খায় চিনি/তারে যোগান চিন্তামণি"**।

তবুও কি খেটেখাওয়া মানুষ সমস্যায় পড়লে চুপ করে বসে থাকতে পারেন? বৃষ্টির অভাবে মাঠে ফসল জ্বলে গেলে, ফসলে পোকা লাগলে, বন্যা বা ভূমিকম্পে সর্বশান্ত হলে, কারখানা বা চা-বাগান লক-আউট হলে, ছেলে বা বৌ-এর জটিল অসুখ হলে কি স্থির থাকতে পারেন? শ্রমিক-কৃষকের জীবনের এইসব সমস্যা আর কামার-কুমোর-তাঁতী, ঘরামি-মিস্ত্রি, ভ্যানচালক-রিক্সাচালক, নাপিত-দর্জিদের সমস্যা আলাদা নয়। শ্রমিক-কৃষকের জীবনের দুদর্শার সাথে এদের জীবনও জড়িত।

আদ্যিকাল থেকে শুনে আসা 'কপালে লিখন' খন্ডন করার সাধ্য এইসব শ্রমজীবী জনতা দেখান না বটে, তবে 'কপালের লিখন' বলে ঘরে বসে থাকতেও তারা পারেন না।

* * *

এবার কতগুলি অভিজ্ঞতা নিয়ে চর্চা করা যাক। উত্তরবঙ্গের একজন গরীব কৃষকের অভিজ্ঞতা শোনা যাক। রমণী বলল "একদিন কাজের অবসরে গ্রামের চায়ের দোকানে বসে আমরা গ্রামের সাত-আটজন আড্ডা মারছি। কেউ বানান করে খবরের কাগজের হেডলাইন পড়ছে, কেউ নিজেদের কাজের ক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে কথা বলছে আবার অল্পবয়সী ছোঁড়ারা কানে তার গুঁজে মোবাইলে গান শুনছে। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

দোকানীর ছোট মেয়েটা ফুটন্ত গরম দুধের গামলাটা উনান থেকে নামাতে গিয়ে তার পায়ের উপর ফেলে দিল। হইচই কান্ড। মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদছে। তার শরীরের নিচের অংশ আর হাতে পড়েছে গরম দুধ। এসব দেখে একজন ছুট্টে গিয়ে এক বালতি ঠান্ডা জল এনে মেয়েটির হাতে পায়ে দিতে লাগল। দোকানীর বউ কোথা থেকে লতা-পাতা জুটিয়ে এনে তা বেঁটে নিয়ে এসে মেয়ের হাতে পায়ে পুরু করে লাগাতে লাগল, কেউ পাখার বাতাস করতে লাগল। আমাদের মধ্যকার একজন ভ্যানওয়ালা দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ভ্যান নিয়ে হাজির হল। দোকানী নির্মল ওঝাকে ডাকার কথা বললেও সকলে একসুরে বলল – দেরি করা যাবে না, হাসপাতালে নিয়ে চল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে ব্লক হাসপাতালে রুগী নিয়ে পৌঁছান হল। ডাক্তারবাবু পরীক্ষার পর বললেন 'কচি বাচ্চা তো, ক্ষত বেশ গভীর হয়েছে। তবে তোমরা প্রাথমিক চিকিৎসা সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে করেছ। সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জল ঢেলে আর লতা-পাতার বাটা দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়ায় তাপ অনেকটা শুষে নিয়েছে বলে মাংস আর পেশীর ক্ষত বেশি গভীরে ছড়াতে পারে নি। দেরি না করে হাসপাতালে এনেছ বলে চিকিৎসা হলে রুগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।' এরপর ডাক্তারবাবু চিকিৎসা শুরু করলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে মেয়েটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল।"

রমণী বর্মণের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? ওরা স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মত বই পড়ে বিজ্ঞান শেখেনি বটে, তবে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবং সময়মত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারস্থ হওয়ায় ছোট্ট মেয়েটিকে বাঁচাতে পেরেছে। ফুটন্ত দুধের উত্তাপ চামড়া ও তার নিচের মাংস ও পেশীর কোষগুলিকে পুড়িয়ে দেয়। দ্রুত ঠান্ডা জল এবং তারপর লতা-পাতার মলম লাগালে ওই উত্তাপের বড় অংশ জল ও মলম শুষে নেওয়ায় ক্ষত গভীরে যেতে পারেনি এবং তারপর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা দ্রুত শুরু হওয়ায় মেয়েটি দ্রুত সেরে উঠেছে।

* * *

তখন ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহ চলছে। দক্ষিণবঙ্গে তখন প্রবল

বর্ষণ হচ্ছে। এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে যায় দামোদর নদী। গ্রামের ৪ কি.মি দূরে রয়েছে নদীর উপর বড় সরকারি বাঁধ। প্রায় প্রতিবছর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে নদীবাঁধ বাঁচাতে বাঁধের লকগেট খুলে দেওয়া হয় রাতের অন্ধকারে। ভেসে যায় ক্ষেতের ফসল, ঘরবাড়ি, মানুষ-পশু। নদী থেকে বহুকাল পলি তোলার কাজ হয় না, নদীর পাড় ভেঙে গেলে তার মেরামতিও বহুকাল বন্ধ। নদী ক্রমশ ফুলে উঠছে। প্রশাসনের কোন 'রা' নেই। কয়েকজন গ্রামের কৃষক ঠিক করল এবার অন্যবারের মত হতে দেব না। দলমত নির্বিশেষে অনিল, শ্রীমন্ত, আকবর, সহিদুলরা ঠিক করল দ্রুত খাল কেটে নদীর জল গ্রামের পতিত ও অনাবাদী জমিগুলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিমদিকের বড় জলাশয় আর ছোট নালাতে তা ফেলতে হবে। প্রশাসনের আপত্তি কর্ণপাত না করে চারদিন-চাররাত প্রায় দু'শজন গ্রামবাসী এই কাজ করল। কাজ শেষ হওয়ার মুহূর্তে বাঁধ থেকে জল ছাড়া হলেও দুটি গ্রাম বাঁধ থেকে ছাড়া জলের দ্বারা সৃষ্ট বন্যার হাত থেকে সেবার রক্ষা পেল।

সব শুনে অনিল, সইদুলদের বললাম "তোমরা প্রকৃত সচেতন ও বিজ্ঞানমনস্কতার কাজ করেছ। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বন্যা কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণ মাত্রার থেকে অতিরিক্ত বেশি হলে, অন্য কোন স্থান থেকে জলপ্রবাহ কোথাও চলে এলে কোন এলাকার নদ-নদী-খাল-বিল যদি তা ধারণ বা পরিবহন করতে না পারে তবে নদ-নদী থেকে জল উপচে ক্ষেত-খামার-ঘর-বাড়ি-রাস্তায় প্লাবন তৈরি করলে তাকে আমরা বন্যা বলি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান আজ বিজ্ঞানের করায়ত্ব। কোন অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত, কোন নির্দিষ্ট সময় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ইত্যাদি তথ্যকে কাজে লাগিয়ে, ভূমির ঢাল, নদীর ক্ষয়কার্যের প্রকৃতি, জল ধারণ ক্ষমতা হিসাব করে নদী বা সমুদ্র উপকূলের বসতি, কৃষি ও শিল্পস্থাপনের অনুমতি দিতে হয়। নদীর নাব্যতা বিচার করে প্রয়োজনে পলি উত্তোলন বা ড্রেজিং করতে হয়, ভৌগলিক অবস্থা বিচার করে ছোট বা বড় বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধের জল থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎসচাষ যেমন হয় তেমনি সারাবছর প্রয়োজনে ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে আগাম ভারী বৃষ্টির তথ্য জেনে বাঁধের জলকে ধীরে ধীরে খালগুলির সাহায্যে ছেড়ে ঊর্ধ্বসীমার অনেক নিচে রাখলে, গ্রামগুলিতে আগে থেকে তৈরি জলাশয়ে সেই জল সঞ্চয় শুরু করলে, নদীর পাড়গুলির মেরামতি নিয়মিত বৈজ্ঞানিকভাবে হলে বন্যা চিরতরে দূর করা সম্ভব। এই বিজ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিশ্বের বহু নদী উপত্যকাকে বন্যামুক্ত করা গেছে। নেদারল্যান্ড নামক একটি দেশের একটা বিশাল অংশের জমি সমুদ্রতল থেকে নিচে অবস্থিত। অথচ সেখানে সমুদ্রে বৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ দিয়ে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে। এসব শুনে ওরা বলল "অতশত জানি না, তবে কপালের লিখন বা ওপরওয়ালার ইচ্ছা শিরোধার্য করে বসে থাকলে সেবারের বন্যার প্রকোপ থেকে আমাদের গ্রাম বাঁচত না।"

* * *

চন্ডীদাসের শালার শ্বশুরবাড়ি হুগলী জেলায়। তার শালা শ্যামল একটা চটকলে বিশ বছর ধরে বদলী শ্রমিকের কাজ করে। একদিন রাতের শিফটে কাজের সময় একজন শ্রমিক মেশিনে পাট তুলতে গিয়ে পা পিছলে রোলারের উপর পড়ে। রোলারের চাকা প্রচন্ড শব্দ করে ভিতরে টেনে নিতে থাকে। হতচকিত শ্যামল পাশের মেশিনে ছিল। প্রথমে শ্রমিক ভাইটিকে টেনে ধরার কথা ভাবলেও মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে ছুটে গিয়ে সুইচ বক্সে লাথি মারে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মেশিনের চাকা ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। ডিপার্টমেন্টের সব শ্রমিক ছুটে এসে শ্রমিকটিকে রোলার থেকে টেনে বার করে। বয়স্ক শ্রমিকটির থেতলে যাওয়া বাঁ হাতের দুটি আঙুল বাদ পড়লেও সে শ্যামলের বুদ্ধিমত্তায় বেঁচে যায়। শ্রমিকদের কাছে 'বোকা শ্যামল' সেদিন হিরো বনে যায়। চটকলের রোলার, পুলি, রড, তাঁত ইত্যাদি কোন যান্ত্রিক নিয়মে ঘোরে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া কিভাবে চলে তার জটিল প্রযুক্তি শ্যামলের জানা নাই, অধিকাংশ শ্রমিকই তার সমগ্রকে হয়ত ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কিন্তু বিদ্যুৎচালিত এই যন্ত্রসামগ্রিকে থামাতে শক্তির উৎসকে বিচ্ছিন্ন করা সবার আগে দরকার এই জ্ঞান বিশ বছর ধরে যন্ত্রের সাথে কাজ করে শ্যামল অর্জন করেছিল বলেই পাশের শ্রমিকের জীবন সে বাঁচাতে পেরেছে। ওই কারখানার মত অধিকাংশ শিল্প কারখানায় যে দক্ষ-অর্ধদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিকরা কাজ করেন তাদের অধিকাংশই যন্ত্রের সাথে উৎপাদন করে যান্ত্রিক প্রণালীর অনেক জটিল প্রযুক্তির জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যান। বহু দুর্ঘটনার হাত থেকে পরস্পর পরস্পরকে বাঁচান।

* * *

গ্রাম গঞ্জে যাঁরা নৌকা চালান তাঁদের আমরা মাঝি বলি। এই মাঝিরা বংশপরম্পরায় নৌকা চালিয়ে আসছেন। যাত্রী পরিবহণ, মাল পরিবহণের পাশাপাশি মাছ ধরার কাজে জেলেরাও নৌকা চালান নদী এবং সমুদ্রে। মানব সভ্যতার বিকাশের প্রায় প্রথম থেকেই, কয়েক হাজার বছর ধরেই নৌকার ব্যবহার হয়ে আসছে। জলপথেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র মানুষ যাতায়াত করত। এই কারণে নদী ও সমুদ্রের উপকূলেই মানুষের বসবাস শুরু হয় পৃথিবীর সর্বত্র।

কিন্তু নৌকা কেন জলে ভাসে তার বিজ্ঞান কি মাঝিদের জানা আছে? মাঝিরা এমনকি আমরা যারা নৌকা, জাহাজ বা স্টীমারে চড়ি তাদের অধিকাংশই তা জানি না।

অনেকে বলবেন কাঠের তক্তা তো জলে ভাসে, তেলও ভাসে। জলের থেকে যারা হালকা তারাই জলে ভাসে। কিন্তু স্টীমার বা বড় জাহাজ তো লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এমনিতে লোহা বা ইস্পাত তো জলের থেকে ভারী, তাই লোহা বা ইস্পাতের দন্ড জলে ডুবে যায়। তবে জাহাজ বা স্টীমার জলে ভাসে কিভাবে? নৌকার উপর চড়লে আমরা অনুভব করি তার উপর ভার চাপালে

জলের নিচ থেকে উপর দিকে ধাক্কা আসে। এটা কি বা কেন এমন হয়? আবার নৌকায় অস্বাভাবিক ভার চাপালে তা ডুবেও যায়। সাধারণ মানুষ এসব নিয়ে খুব বেশি ভাবে না, শুধু নৌকায় ভার বেশি হলে অথবা নদী বা সমুদ্রে ঝড় উঠলে ডুবে যাওয়ার ভয় পায়।

কোন কঠিন পদার্থ জলে বা অন্য তরলে এমনকি গ্যাসের মধ্যে ভেসে থাকার নিয়মকে **উদস্থিতিবিদ্যা** বলে। **বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস** আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে এই বিজ্ঞান আবিষ্কার করেন।

কোন কঠিন বস্তু আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে কোন তরল (যেমন জল) বা গ্যাসে (যেমন বাতাস) স্থির অবস্থায় নিমজ্জিত বা ডুবে থাকলে ওই তরল বা গ্যাস কঠিন বস্তুটির উপর এক উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে, যার পরিমাণ হল ওই বস্তুটি তরলে বা গ্যাসে নিমজ্জিত হওয়ার জন্য যতটা তরল বা গ্যাস অপসারিত করে তার ভরের সমান। যে উর্ধ্বমুখী বলের জন্য কঠিন বস্তুটি ভেসে থাকে তাকে বলে **প্লবতা**। প্রাচীনযুগের বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস সিসিলি দ্বীপের সাইরাকস শহরে যীশু খ্রিস্টের জন্মের ২৮৭ বছর আগে জন্মে ছিলেন।

লোহার দন্ডকে জলে ডোবালে তা যে পরিমাণ জল অপসারিত করে তার ভার লোহার দন্ডের ভার থেকে অনেক কম বলে লৌহ দন্ড ডুবে যায়। কিন্তু ওই লৌড দন্ডকে পিটিয়ে পাতলা ও চ্যাপটা আকৃতির বানিয়ে সেই লোহার পাতকে জলে ডোবালে সে যতটা জল অপসারিত করে তার ভার লোহার পাতের ভারের চেয়ে বেশি হয়। ফলে উর্ধমুখী প্লবতা নিম্নমুখী লোহার পাতের ভারের বেশি হওয়ায় জলে ভেসে থাকে। এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই নৌকা, জাহাজ, স্টীমার বানানো হয় এবং তার ভার বহণের ক্ষমতাও নির্দিষ্ট থাকে।

আবার দাঁড় টেনে চলন্ত নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিজ্ঞানের অন্য নিয়মকে কাজে লাগিয়ে। এটি হল **গতির বিজ্ঞান**। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী **আইজ্যাক নিউটন** ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে ফিলোসফি ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা গ্রন্থে গতির তিনটি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেন। গতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর তৃতীয় সূত্র হল : যখন কোন একটি বস্তু দ্বিতীয় বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তখন দ্বিতীয় বস্তুটি সাথে সাথেই প্রথম বস্তুটির উপর সমান পরিমাণে এবং ঠিক বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করে।

এই ক্ষেত্রে নৌকার দাঁড়ের সাহায্যে নদী বা সমুদ্রের জলে পিছন দিকে বল প্রয়োগ করা হলে জলও নৌকার উপর সমান পরিমাণে বল সামনের দিকে প্রয়োগ করে। এইভাবে দাঁড়ের সাহায্যে পিছনে জলকে ঠেললে নদীর জল নৌকাকে সমান বলে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। এইভাবে দ্রুত, একাধিক দাঁড় ব্যবহার করে এবং পালের সাহায্যে বাতাসের গতির সাহায্য নিয়ে নৌকা চালানো হয়। মোটর চালিত নৌকা, স্টীমার বা জাহাজও একই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জলে পরিভ্রমণ করে।

মাঝিরা কিন্তু এসব বিজ্ঞান না জেনেও শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নৌকা চালিয়ে আসছেন দক্ষতার সাথে যুগ যুগ ধরে।

* * *

চাষের সময় কৃষকেরা কতগুলি কাজ পর পর করে থাকেন। ধরুন ধান চাষের ক্ষেত্রে। প্রথমে জমিকে লাঙ্গল বা ট্রাক্টরের সাহায্যে ভাল করে কর্ষণ করা হয়। তারপর সেচ দিয়ে মাটি নরম করে প্রয়োজনমত সার দেওয়া হয়। ধানের বীজ আলাদাভাবে অন্য জমিতে বুনে চারা তৈরি করে সেই চারা তুলে এনে একটু ফাঁক রেখে সারিবদ্ধভাবে চারা বোনা হয়। চারা বাড়তে থাকার সময় অনাবৃষ্টি হলে সেচ দেওয়া হয়, আগাছা উপড়ে ফেলা হয়। পোকা বা পতঙ্গের আক্রমণ হলে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। ধান পাকলে খানিকটা খড় শুদ্ধ ধান কেটে গোছ করে বেঁধে তা ঘরে তুলে আনা হয়। তারপর ধান ঝাড়া, ধান সেদ্ধ করা এবং সবশেষে ধানকলে গিয়ে ধান থেকে চাল তৈরি করা হয়। সমগ্র চাষের কাজটা সুশৃঙ্খলভাবে, নিয়মিত, একটার পর একটা নিপুণভাবে করতে হয়। কৃষি বিজ্ঞান না জেনেও ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করে থাকেন লক্ষ-কোটি কৃষক।

এখন কৃষি বিজ্ঞান জানা থাকলে কি হত? কোন জমিতে কোন সময় কোন ফসল বুনলে ভাল হয় তা জানতে মাটি পরীক্ষার দরকার। মাটি পরীক্ষা করলে জানা যায় মাটির সঠিক উপাদান। নির্দিষ্ট জমিতে নির্দিষ্ট ফলস বুনতে গেলে সেই জমিতে কোন উপাদানের (যেমন নাইট্রোজেন, পটাশ, ফসফরাস, লৌহ, জিঙ্ক ইত্যাদি) ঘাটতি কি পরিমাণে আছে তা জানা থাকলে কোন সার (জৈব বা অজৈব যাই হোক) কি পরিমাণে ব্যবহারের প্রয়োজন জানা যায়। এটা জানা থাকলে জমিতে কম বা অধিক সার প্রয়োগ হয় না এবং সঠিকমাত্রায় ফলন পাওয়া যায়। ফসলে পতঙ্গ বা পোকার আক্রমণ কখন, কেন, কিভাবে হয়? কোন পতঙ্গ কোন ফসলের কি ক্ষতি করে বিষদে জানা থাকলে সঠিক এবং পরিমাণমত কীটনাশকের ব্যবহার করা যায়। আন্দাজে কীটনাশকের ব্যবহার ফলনের ক্ষতি করে। কোন জমিতে কোন ফসলের বৃদ্ধিতে কত জলের প্রয়োজন জানা থাকলে সঠিক পরিমাণে সেচ দেওয়া বা জল নিকাশীর ব্যবস্থা করা যায়। ফসল কাটার সময় ধানের (বা অন্য ফসলের) গোড়া জমিতে কতটা পরিমাণ রাখা উচিত, ফসল কাটার পর সেই গোড়া জমিতে পোড়ালে বা পচালে কোন ক্ষেত্রে জমির কতটা উর্বরতা বাড়ে তা জানলে পরবর্তী চাষ সঠিক হয়। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ বৃহৎ কৃষিফার্মেই করা সম্ভব ক্ষুদ্র কৃষিজোতে নয়। তবুও কৃষি বিজ্ঞান জানা থাকলে কৃষকদের মেহনত সফল হতে পারত যা এখন পুরোমাত্রায় হয় না।

* * *

এখন যাওয়া যাক সাবেকি কামারশালা, ওয়ার্কশপ বা আধুনিক যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায়। এখানে পেরেক, স্ক্রু, হাতুড়ি, কাস্তে, কোদাল, গাঁইতি, কুরুল, শাবল, বল্লম ইত্যাদি তৈরি হয়। এগুলিকে উৎপাদনের সাধিত্র (যে হাতিয়ার দিয়ে উৎপাদন করা হয়) বলা

হয়। আধুনিক যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় এগুলি উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়। এছাড়াও কারখানায় তৈরি হয় বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি। মানুষের নিত্যনতুন দৈনন্দিন ব্যবহার থেকেই এসবের উৎপত্তি হয়েছে। এগুলি কোনটা ফুটো করতে, কোনটা ধাতুকে কাটতে, কোনটা শক্ত পদার্থ ভাঙতে, কোনটা তাদের মধ্যে প্যাঁচ বা থ্রেড তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক সুবিধা আনতে বা ব্যবহারের অসুবিধা দূর করতে, এককথায় শ্রমের উৎকর্ষতা বাড়াতে এবং শ্রম লাঘব করতে, বিজ্ঞানের ভাষায় যান্ত্রিক সুবিধা পেতে এগুলি একে একে সৃষ্টি হয়েছে বা হয়ে চলেছে। প্রযুক্তির বিকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রমশক্তির কার্যকারিতা বাড়ানো। শ্রমিকরা কারখানায় প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগ করেন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, তত্ত্বগতভাবে তা না জেনেই।

* * *

আসলে আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাতে বিছানায় শুতে যাওয়া অবধি অজান্তে বস্তুবাদ তথা বিজ্ঞানেরই অনুসরণ করে থাকি। যেমন ধরুন কাজে যাওয়ার সময় চলন্ত বাসে ওঠা-নামা। চলন্ত বাসে ওঠার সময় বাসের গতি বা তার কাছাকাছি গতিতে আগে থেকে ছুটে বাসের হ্যান্ডেল ধরলে সহজে বাসে ওঠা যায়। আবার চলন্ত বাস থেকে নামার সময় সামনের দিকে মুখ রেখে নামার সাথে সাথে শরীর পিছন দিকে হেলিয়ে দিলে বিপদ ঘটে না। **জাড্যতার** এই নিয়মের অন্যথা ঘটলেই জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। এক্ষেত্রে আমরা অজান্তে গতিবিজ্ঞানের **জাড্যতার সূত্র** প্রয়োগ করছি। আমরা ঢেঁকিতে ধান থেকে চাল তৈরির সময়, শাবল দিয়ে প্রকান্ড ভারী জিনিস তুলে সরানোর সময়, প্লায়ার্স বা চলতি কথা প্লাস দিয়ে একটা কোন স্ক্রু খোলা বা লাগানোর সময়, কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটার সময়, বিশেষ রকম হাতুড়ি দিয়ে বোর্ডে আটকানো পেরেক টেনে তোলার সময় **প্রথম শ্রেণীর লিভার** এর নীতি ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা পাই। কঠিন বা অসাধ্য কাজ এই যন্ত্রগুলি সহজে করে দেয়। আমরা ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি চালানোর সময়, বিশেষ যন্ত্র যা বোতলের ছিপি খোলে তা ব্যবহারের সময়, নখ কাটার যন্ত্র ব্যবহার করার সময়, জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটার সময় **দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার** এর নীতি ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা পাই। আবার আমরা রান্নার হাতা ব্যবহার করে, মাছ ধরার বড়শি ব্যবহার করে, হাতে-পায়ে সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটে গেলে তা তোলার সময় অথবা ভুরুর লোম যারা তোলেন তা তোলার সময় সন্না (tweezers) ব্যবহার করার সময় আমরা **তৃতীয় শ্রেণীর লিভার** ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা পাই। এক্ষেত্রে বলা দরকার **লিভার** (Lever) হল একপ্রকার দন্ড যা একটি যন্ত্র মেশিনারির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং ঠেলে বা টেনে সেই যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়। এই ক্ষেত্রে দন্ডটি একটি hinge (আলম্ব) বা fulcrum এর সাথে যুক্ত থাকে।

আমরা নদী বা পুকুরে স্নান করার সময় জলে ভেসে থাকার ও চলাচল করার বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করি। আমরা রান্নার সময় খাবারকে দ্রুত সেদ্ধ করার জন্য হাঁড়িতে ঢাকা দেই। এক্ষেত্রে আমরা হাঁড়িতে **বায়ুর চাপবৃদ্ধি করে জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়ে দেই**। এতে ভাতের জল দ্রুত ফোটে। চাল দ্রুত সেদ্ধ হয়। আমরা গ্রীষ্মকালে হালকা রঙের সূতির কাপড় জামা ব্যবহার করলে আরাম পাই আবার শীতে গাঢ় রঙের পশমের পোষাক ব্যবহার করে আরাম পাই। এক্ষেত্রে সাদা বা হালকা রঙের সূতির পোশাক কম তাপ শোষণ করে বলে শরীর সূর্যের উত্তাপ কম শোষণ করে আর পশমের পোষাক শীতকালে শরীরের উষ্ণতা ধরে রাখে এবং গাঢ় রঙের পোষাক সূর্যের উত্তাপ বেশি শোষণ করায় শরীর উষ্ণ থাকে।

এইভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে বস্তুবাদের তথা বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে চলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সফল হই। আর অসাবধানতায় বা অজ্ঞানতাবশত সেই নিয়ম না মেনে চললে বিপদে পড়ি।

শ্রমজীবী মানুষ দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত বস্তুবাদ অনুসরণ করে চলেন কিন্তু তাদের কাজের শেষে ভাববাদী দর্শন চর্চা করতেই ব্যস্ত দেখা যায়। বস্তুবাদ বলে কোন বস্তু বা ঘটনাকে দেখেই মানুষের ভাবনার উদয় হয় আর ভাববাদ বলে আগে ভাবনা বা চিন্তা পরে বস্তু। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ভাবনা থেকেই বস্তুজগৎ, মহাবিশ্ব, মানবসমাজ সবকিছুর সৃষ্টি। তার ইচ্ছাতেই জগতের সব কিছু ঘটে। সুতরাং তার ভজনাই আমাদের কাজ। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই ভাববাদের অনুশীলন করে পেটের খিদেও মেটে না, সমস্যার সমাধানও হয় না।

* * *

এতক্ষণ আমরা বিজ্ঞানের কথা বললাম। কিন্তু আমরা কি সকলে জানি বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়? অনেকে বলেন বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। কোন বিশেষ জ্ঞান? কেউ বলতে পারেন চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণের সময় বাতের ব্যাথা বাড়ে। এটা একটা বিশেষ জ্ঞান। না এটা বিশেষ জ্ঞানও নয়, সত্যও নয়, বিজ্ঞানও নয়। **বস্তুর উৎপত্তি, অস্তিত্ব, বিকাশ – ক্রমিক পরিবর্তন, মৌলিক রূপান্তর ইত্যাদির কারণ, নিয়ম এবং ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানই হল বিজ্ঞান।** অজানাকে জানার জন্য মানবজাতির অগ্রণীদের অক্লান্ত প্রয়াস এবং তাদের নিরন্তর গবেষনালব্ধ জ্ঞান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূ-বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি। ম্যাথামেটিকস বা অঙ্ক হল বিজ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ।

* * *

বিজ্ঞান শব্দের এককথায় অর্থ হল কোন কিছুর নিয়ম বা কারণ। শ্রমজীবী মানুষকে তাই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় সচেতনভাবে সমাজ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্ত উন্নত জীবনের জন্য এর বিকল্প নেই। ■

বিজ্ঞানের খবর

ডিসেম্বর ২০১৭ ঃ

১. সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, জুরিখের গবেষকরা জীবন্ত বস্তু ব্যবহার করে একটি ত্রিমাত্রিক (3D) প্রিন্টার প্রদর্শন করেন যা প্লাস্টিক বা ধাতুর মত "মৃত বস্তু" তে পাওয়া যায় এমন অন্যান্য বৈশিষ্টগুলি সরবরাহ করবে। (রিট্রাইভড)

●ভূবিজ্ঞানীরা এমন একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন যা কয়েক ঘন্টার বদলে কয়েক মিনিটের মধ্যে বড় ভূমিকম্পের মাত্রা হিসেব করতে পারবে অঞ্চলের গ্র্যাভিটেশনাল (মহাকর্ষীয়) ফিল্ড থেকে। (রিট্রাইভড)

৬. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে দূরবর্তী কোয়াসার ULAS J1342+0928 এবং অতিবৃহৎ কৃষ্ণ গহ্বর আবিষ্কার করেছেন। (নেচার)

●হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের'র Wyss ইনস্টিটিউটের জীববিজ্ঞানের জন্য অনুপ্রাণিত প্রকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং) ঘোষণা করেছে যে তারা ডি এন এ-র গঠন জটিলতাকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে প্রকাশ করতে পারবে "DNA bricks" মডেলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য DNA bricks হল একপ্রকার কম্পিউটার মডেল পদ্ধতি যার সাহায্যে ডি এন এ-র ত্রিমাত্রি গঠনকে ব্যাখ্যা করা হয়। (সায়েন্স ডেইলি)

৭. ●আর্বানা-শ্যাম্পেইনের ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদরা এক নতুন ফর্ম এর matter আবিষ্কার করেছেন যার নাম এক্সিটোনিয়াম (excitonium)। (রিট্রাইভড)

●ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিউট অফ টেকনোলজি-র গবেষকরা এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা কুইনোলোন নামে পরিচিত অ্যান্টিবায়োটিককে আরও শক্তিশালী করে ব্যাকটেরিয়াকে আরও নিশ্চিতভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। এই কুইনোলোন অ্যান্টিবায়োটি সংক্রামক ডায়রিয়া, টাইফয়েড, প্রস্টেট জনিত অসুখ, জটিল সাইনাস ঘটিত রোগ চিকিৎসায় কাজে লাগে। (রিট্রাইভড)

৮. ●বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আফ্রিকা থেকে **হোমা সেপিয়ান্স** এশিয়াতে কমপক্ষে ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগে পদার্পণ করেছে। আগে ধারণা ছিল তা এশিয়াতে মাত্র ৬০ হাজার বছর আগে এসেছিল। (রিট্রাইভড)

১১. ●ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডন এর গবেষকরা জানিয়েছেন যে **হান্টিংটন** রোগের জন্য জিনগত ত্রুটিটি প্রথমবারের মতো রুগীদের ক্ষেত্রে সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে IONIS-HTTRx নামক একপ্রকার পরীক্ষামূলক ঔষধ ব্যবহার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হান্টিংটন রোগ হল একপ্রচার মস্তিষ্কের ত্রুটি জনিত অসুখ, মানব মস্তিষ্কের বেসল গ্যাংলিয়া অঞ্চলের নার্ভ কোষ আক্রান্ত হলে এই অসুখ হয়। এই অসুখের ফলে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায়, চিন্তাশক্তি কমে যায়, নানা মনোরোগ সৃষ্টি হয়। (বি বি সি নিউজ)

১৩. ●কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদরা একটি ন্যানো ফ্যাবরিকেটেড সেমিকন্ডাক্টর স্ট্রাকচারে কৃত্রিম গ্রাফিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। (কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি)

●কার্বন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম এর গবেষকরা এই প্রথম কৃত্রিমভাবে গ্যাসোলিন এবং ডিজেল প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে হাইড্রোজেনকে সংগ্রহ করে তার সংশ্লেষণ করে। সংস্থার "বাতাস থেকে জ্বালানী" প্রযুক্তি এই প্রথম সাফল্য অর্জন করল। (রিট্রাইভড)

●ব্রিটিশ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা জিন থেরাপির একটি নুতন প্রযুক্তি আবিষ্কার দ্বারা **হিমোফিলিয়া এ** আক্রান্ত রুগীর চিকিৎসায় সাফল্য পেয়েছেন। এই রোগে আক্রান্ত রুগীর রক্তপাত শুরু হলে তা বন্ধ হতে চায় না। (বি বি সি নিউজ)

●নাসা কেপলার 90i নামক একটি বৃহৎ গ্রহকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে যা কেপলার 90 নামক নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে। এই নক্ষত্রের আমাদের সূর্যের ন্যায় ৮টি গ্রহ আছে। (নাসা)

●গ্রীসের লেচাইও তে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে নতুনভাবে প্রাচীন রোমান ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এক বড় মাপের প্রমাণ মিলল। (গার্ডিয়ান)

১৮. ●বিজ্ঞানীরা এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার একটি পাথরে ৩৬৫ কোটি বছরের প্রাচীন আণুবিক্ষণিক জীবের উপস্থিতি আবিষ্কার করলেন, **যা পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রাচীনতম জীবের প্রমাণ**। (রিট্রাইভড)

১৯. ●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের FDA (Food & Dray Ad-

ministration) সেদেশে **রেটিনাল ডিস্ট্রফি** রোগে আক্রান্ত রুগীদের উপর Lux truna নামক জিন থেরাপি প্রয়োগের অনুমতি দিল। জন্মগতভাবে রেটিনার অসুখে আক্রান্ত রুগীরা এই চিকিৎসার সুবিধা পেলে তাদের অন্ধত্ব মোচনে এটি এক বিরাট ভূমিকা আগামী দিনে রাখতে পারে। (এন পি আর)

জানুয়ারি ২০১৮

২. ●কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানীরা কোষের মাপের আকার পরিবর্তনকারী রোবটের "পেশী" তৈরি করতে সক্ষম হলেন। (ইউরেক অ্যালার্ট)

১০. ●এম্পিরিয়াল কলেজ অফ লন্ডন এবং কিংস কলেজ অফ লন্ডন দ্বারা প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্রিকায় ত্রিমাত্রিক বায়োপ্রিন্টিং পদ্ধতির বিকাশের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। শরীরের নরম কোষ দ্বারা তৈরি অঙ্গগুলি, যেমন ফুসফুসের আরও নিখুঁত ছবি তুলতে এই পদ্ধতি কাজে লাগে। (এম্পিরিয়াল কলেজ, লন্ডন)

১৮. ●গবেষকরা দাবি করছেন যে একপ্রকার রক্ত পরীক্ষা বা Liquid biopsy র সাহায্যে ৮ ধরনের ক্যানসারের টিউমারের উপস্থিতি অনেক আগেই ধরা যাবে। রক্তের ডি এন এ এবং প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করে এই পরীক্ষা দ্বারা এই Liquid biopsy ১০০৬ জন রুগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ৭০% সাফল্য পাওয়া গেছে। (সায়েন্স)

●গ্লাডস্টোন ইনস্টিটিউটের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা চর্ম কোষকে স্টেম সেলে পরিণত করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন CRISPR ব্যবহার করে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে CRISPR হল একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে চিহ্নিত জিনকে সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে। (সায়েন্স ডেইলি)

২৫. ●জেনেটিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণা দ্বারা গবেষকরা জানালেন যে **আদি বাসভূমি আফ্রিকা থেকে আধুনিক মানুষ অন্তত ১ লক্ষ ৯৪ হাজার বছর আগে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে**। (সায়েন্স)

২৯. ●বিজ্ঞানীরা এই প্রথম জানিয়েছেন যে অন্তত ৮০ কোটি ভাইরাস (যার অধিকাংশই সমুদ্রে সৃষ্ট) প্রতিদিন বায়ুমন্ডল থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রতি বর্গ মিটার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজোড়া বায়ুমন্ডলীয় ভাইরাসের স্রোতের দ্বারা। এই ভাইরাসের স্রোত প্রবাহ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে এরাপ্লেন যে উচ্চতায় চলাচল করে তার থেকে কম উচ্চতায় প্রবাহিত হয় এবং জীবজগৎকে আক্রান্ত করে। (কিউ ইয়র্ক টাইমস)

ফেব্রুয়ারি ২০১৮

৫. ●গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে পৃথিবীতে যা পাওয়া যায় না এমন সুপার আয়োনিক জল ইউরেনাস এবং নেপচুনে পাওয়া যায়। (রিট্রাইভড)

৯. ●এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এই প্রথম **কৃত্রিমভাবে মানুষের ডিম্বাণু জন্ম দেওয়া সম্ভব হল**। (রিট্রাইভড)

১৪. ●জার্মাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় গবেষকরা দাবি করেছেন যে ইঁদুরের শরীরে এনজাইম বিটা সিক্রেটেজ (BACE-1) সঞ্চালন বন্ধ করে দিলে plaques নামক রাসায়নিক গঠন করে যা অ্যালঝাইমার অসুখের কারণ। (নিউজ উইক)

১৬. ●গবেষকরা দাবি করেছেন যে এই প্রথম এমন নতুন প্রকার আলোর সন্ধান পাওয়া গেল যা কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরির কাজে লাগবে। (নিউজ উইক)

২৮. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন যে বিগ ব্যাং-এর ঘটনার প্রায় ১৮ কোটি বছর পর সর্বপ্রথম আয়ন সংযুক্তিকরণ যুগের সূচনা হয়, এটা আদিমতম নক্ষত্র থেকে আসা আলোর একটি পরোক্ষ সনাক্তকরণ। (নেচার)

মার্চ ২০১৮

১৩. ● গবেষকরা দাবি করেছেন যে প্রাচীন ডানাওয়ালা ডাইনোসররা আকাশে উড়তে পারত কিন্তু বর্তমান যুগে পাখি যেভাবে ওড়ে সেভাবে নয়। (রিট্রাইভড)

১৪. ●ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ৭১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন।

১৫. ●গ্লাডস্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক নতুন ধরনের সেলুলার থেরাপির প্রয়োগ করেছেন যা অ্যালঝাইমার রোগের মোকাবিলার ক্ষেত্রে আশা যোগায়। (নিউরন)

২৬. ●জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়, বাল্টিমোর, মেরীল্যান্ডের একজন শল্য চিকিৎসক এই প্রথম কোন পুরুষের সমগ্র পুরুষাঙ্গ (Penis and scrotum) প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম হলেন। (বি বি সি নিউজ)

এপ্রিল ২০১৮

২. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথম পৃথিবী থেকে সবচেয়ে

বেশি দূরবর্তী নক্ষত্র ইকারাস (আগে নাম ছিল MACS J1149 Lensed Star 1) কে খুঁজে পেতে সক্ষম হলেন যা পৃথিবী থেকে ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। (রিট্রাইভড)

১০. ●জাপানের গবেষকরা উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মিনামি-তোরি-শিমা অঞ্চলের গভীর সমুদ্রের নীচের মাটিতে বিরল মৌলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন। (সি এন বি সি)

১৮. ●নাসা বর্হিজগতের গ্রহ নক্ষত্র সর্বেক্ষণের স্যাটেলাইট (TESS) উৎক্ষেপণ করল। (বি বি সি নিউজ)

২৫. ●গবেষকরা প্রমাণ দিলেন যে পৃথিবীতে প্রথম জল আনার ক্ষেত্রে অ্যাস্টেরয়েড বা গ্রহাণুপুঞ্জের বড় ভূমিকা আছে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

৩০. ●গবেষকরা জানিয়েছেন যে বর্তমানে বিশ্বের সমস্ত সজীব প্রাণীর দেহে যে ৬৩৩১ গ্রুপের সাধারণ জিন আছে সেগুলির সবই একই পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি হয়েছে ৬৫ কোটি বছর আগে প্রিক্যামব্রিয়ান যুগে। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

মে ২০১৮ ঃ

১৪. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বৃহস্পতির উপগ্রহ ইউরোপা'র ভূ-ত্বকের নীচে উষ্ণ জলের প্রবাহ উঠে আসা (water plume activity) চিহ্নিত করেছেন। গ্যালিলিও স্পেস প্রোবের সাহায্যে ১৯৯৫-২০০৩ পর্যায়ের গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। গবেষকরা শনি গ্রহের উপগ্রহ এনসেল্যাডাস এর ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন। (রিট্রাইভড)

●প্রত্নতত্ত্ববিদরা বিলুপ্ত প্রাণী হোমো নালেডি-র মস্তিষ্কের খুলি পেয়েছেন। যে মানবতের প্রাণীটি পৃথিবীতে ছিল আজ থেকে ২ লক্ষ ২৬ হাজার থেকে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার বছর আগে। এই মনুষ্যতের প্রাণীটির মাথার খুলি ছোট হলেও তা জটিল গঠনযুক্ত এবং এর সাথে আধুনিক মানুষের প্রচুর মিল পাওয়া যায়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

২৩. ●পুরাজীববিদরা হারামিইডা গোষ্ঠীর প্রাণীর (একপ্রকার mammalia form cynodonts) একটি নতুন প্রজাতি (Specis) খুলি পেয়েছেন যার নাম Cifelliodon wahkarmooshuh. এটি পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকায় ১৩ কোটি বছর প্রাচীন একটি ফসিল হয়ে যাওয়া ডাইনোসর এর পায়ের নিচে। (নেচার)

২৪. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন যে বামন গ্রহ প্লুটো (বর্তমানে বিজ্ঞানীরা একে আর গ্রহের মর্যাদা দিচ্ছেন না।) সৃষ্টি হয়েছিল নানা প্রকার উল্কাপাত ও গ্রহাণুর সংযুক্তির ফলে। (স্পেস ডট কম)

জুন ২০১৮ ঃ

৪. ●এই প্রথমবার সার্নের ATLAS এবং CMS পরীক্ষার দ্বারা সরাসরি **হিগস বোসন কণা এবং শীর্ষ কোয়ার্ক দ্বারা কাপলিং প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হল**। (ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখ)

৫. ●কেস ওয়েস্টার্ন রিসার্ভ ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন এই প্রথম কৃত্রিমভাবে হিউম্যান প্রাইয়ন তৈরি করতে সক্ষম হল। প্রাইয়ন হল একপ্রকার মানবদেহের মস্তিষ্কের অসুখ যা জ্যাকব ডিসিস, মারাত্মক পারিবারিক ইনসোম্যানিয়া ইত্যাদি হিসাবে পরিচিত। এতদিন জানা ছিল এই অসুখ জিনগত অথবা আকস্মিক সৃষ্টি হয়। কৃত্রিমভাবে এই অসুখের কারণ আবিস্কৃত হওয়ায় এই জটিল রোগের চিকিৎসা আগামীদিনে হওয়া সম্ভব হতে পারে।

৬. ●দক্ষিণ চীনের ইয়াংটেজ জর্জেস অঞ্চল থেকে ৫৪.৬ কোটি বছরের প্রাচীন প্রাণীর পায়ের ছাপ আবিস্কৃত হল। এই আবিষ্কার এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন পা-যুক্ত প্রাণীর প্রমাণ দিল। (বি বি সি নিউজ)

৭. ●নাসা ঘোষণা করেছে যে কিউরিওসিটি রোভার যন্ত্র মঙ্গলগ্রহের বায়ুমন্ডলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে মিথেনের চক্রাকার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। এছাড়া কেরোজেন এবং অন্যান্য জৈব পদার্থের উপস্থিতিও লক্ষ্য করেছে। (নাসা)

৮. ●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার কাজ শুরু করেছে। এই কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ২ লক্ষ ট্রিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে সক্ষম। (রিট্রাইভড)

২৬. ●ক্যালির্ফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা, লস এঞ্জেলস এর গবেষণাগারে প্রথম কৃত্রিম T সেল তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই T সেল আকার ও চরিত্রে প্রকৃত মানব কোষের ন্যায়।

২৭. ●জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শনিগ্রহের উপগ্রহ এনসেল্যাডাসে জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ (macro molecular organics) চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। (নাসা) ■

সংগঠন সংবাদ

প্রায় দীর্ঘ ৯ মাস পর সমীক্ষণ প্রকাশিত হল। এই দীর্ঘ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগঠনের কর্মীরা নানা কর্মসূচী পালন করেছেন। স্থানাভাবে তা অতি সংক্ষেপে রাখা হচ্ছে।

বইমেলা ঃ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের কর্মীরা সমীক্ষণ ও নতুন প্রকাশিত ইংরাজি মুখপত্র Insight নিয়ে মানুষের কাছে গেছেন। আমরা দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, জলপাইগুড়ি, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ, পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাক্ষসখালি, সোনারপুর এবং রারুইপুর, কলকাতার বেহালা অন্ধ বিদ্যালয় এবং বেহালা সখেরবাজার, কলেজস্ট্রীট লিটল ম্যাগাজিন মেলা এবং কলকাতা বইমেলায় অংশ নিয়েছি। প্রতিটি মেলাতেই পাঠকরা সোৎসাহে সমীক্ষণ ও Insight সংগ্রহ করেছেন।

বার্ষিক সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান ঃ এবছর কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয়ভাবে এক জায়গায় নয়, ব্যাপক মানুষের মধ্যে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য আঞ্চলিক স্তরে এই অনুষ্ঠান করার। সেই অনুযায়ী এবছর মুখ্য অনুষ্ঠান রাখা হয় বিতর্ক। বিষয় ঃ **'ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতে বিজ্ঞানের প্রসারে সরকারের ভূমিকা সদর্থক'**। এই মোশনের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত রাখবেন। এছাড়া সদ্য প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর উপর সংগঠনের দ্বারা প্রস্তুত করা একটি স্লাইড শো প্রদর্শন। এছাড়া কোন কোন অঞ্চলে বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। ২২শে এপ্রিল অনুষ্ঠান হয় শিলিগুড়িতে। এই অনুষ্ঠানে দার্জিলিঙ পাবলিক স্কুলের একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের নিয়ে মডেল প্রদর্শন করেন। একজন সদস্য এবং একজন স্থানীয় মানুষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্টিফেন হকিং-এর জীবনীমূলক স্লাইড শো প্রদর্শন হয়। কিন্তু মূল অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বিতর্কে বক্তারা আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেন নি। এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণায় উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রসারের বিভিন্ন উদাহরণ উঠে এলেও সমাজের ব্যাপক জনতার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার সরকার দ্বারা কতটা হয়েছে এবং কেনই বা হয়নি, যতটুকু বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে তার মুখ্য কারণ কী এইসব দিক বক্তাদের বক্তব্যে উঠে না আসায় অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হয় নি। বিচারকরাও অনুষ্ঠানে বক্তাদের বক্তব্য বিচার সেভাবে করেন নি।

৫ই মে কলকাতার বেহালা মহিলা কলেজে অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে মডেল প্রদর্শন হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গানের পাশাপাশি হাওড়া জেলার আমতা ইউনিট দ্বারা কুসংস্কার বিরোধী শ্রুতি নাটক হয়। নাটকটি আকর্ষণীয় হয়নি। এখানকার বিতর্ক অনুষ্ঠান যথেষ্ট আকর্ষনীয় হয়েছে। পক্ষে একজন এবং বিপক্ষের ৩ জন ক্ষুরধার যুক্তি পেশ করেন। পক্ষের বক্তারা দেশে বিজ্ঞান ও প্রসারে সরকারের ধারাবাহিক ভূমিকা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনই বিপক্ষের বক্তারা বিজ্ঞানের প্রসার বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা রাখেন, যুক্তি-তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দেন যে এই বিকাশ হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে। রাষ্ট্র এই বিকাশকে ততটুকুই উৎসাহ দেয় যতটুকু তা শোষণ ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করে, তার বেশি নয়। ব্যাপক শ্রমজীবী জনতার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, তাদের বিজ্ঞান মনস্ক করার পক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা কার্যত ঋণাত্মক। বিতর্কে যুক্তির বিচারে বিরোধী মতকেই জয়ী ঘোষণা করেন বিচারপতিরা।

১৯শে মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের অনুষ্ঠানে গ্রামীণ যুবছাত্র শ্রমজীবী জনতার ব্যাপক জমায়েত হয়। প্রায় ১০টি স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা ৬০টি মডেল নিয়ে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীকান্তপুর ইউনিটের সদস্যরা অলৌকিকতার বিরুদ্ধে সুন্দর প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিতর্ক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা তেমন কোন যুক্তিই হাজির করতে পারেন নি। সভায় স্থানীয় ছোট ও বড়রা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২০শে মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমার অনুষ্ঠানে জমায়েত ও শৃঙ্খলা খুব ভাল ছিল। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী মডেল প্রদর্শন করেন। বিতর্ক অনুষ্ঠানেও মোশনের পক্ষে ও বিপক্ষে খুরধার যুক্তি পেশ করা হয়। বিচারকের বিচারে মোশনের বিপক্ষ জয়ী হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং নিয়ে স্লাইড শো বাতিল করা হয়।

১৯শে জুলাই হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত একটি স্কুলে আলোচ্য বিষয়ের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর জীবন নিয়ে তথ্যচিত্র এবং শ্রুতি নাটক হয়। বিতর্ক অনুষ্ঠানে পক্ষে ও বিপক্ষে স্কুলে বিভিন্ন বয়সী ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় রাখে। বিচারকরা কোন পক্ষকে জয়ী না করে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণকারীদের মান বিচার করেন। শ্রুতি নাটক 'আলোর নীচে অন্ধকার' বিষয় হিসাবে ঠিক হলেও দর্শকদের মন জয় করতে পারে নি।

আগামী ২৬শে অগাস্ট আসানসোল শহরে বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং সেমিনার 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তার মোকাবিলার পথ' শীর্ষক হতে চলেছে।

গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান ঃ বিগত ৯ মাসে রাজ্যের বিভিন্ন

প্রান্তে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম হাতিয়াডাঙ্গা ও ফারাবাড়ি; পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় অঞ্চলের নিমতলা; উত্তর ২৪ পরগণার বনগ্রাম; পুরুলিয়া জেলার কোটশিলা; দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথর প্রতিমা, লক্ষ্মীকান্তপুর, দেওয়ানগঞ্জ, গাববেড়িয়া, নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নানা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়েছে। ২৩শে মার্চ শহীদ ভগৎ সিং-ও তার সাথীদের স্মরণে সাইকেল যাত্রা, পথসভা, জনসভা সহযোগী সংগঠনের সাথে হয়েছে।

হাওড়া জেলার পুরাশ-কানপুর নটবর পাল বিদ্যামন্দিরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানের প্রদর্শন ও সেমিনার হয়।

মে-দিবস উদ্‌যাপন ঃ প্রতি বছরের মত এবছরও সহযোগী সংগঠনগুলির সাথে বিজ্ঞান মনস্ক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করে। ১লা মে-র আগে বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্টার লাগানো এবং ১লা মে কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলের জমায়েতে এবং কলকাতার রাজপথের মিছিলে অংশ নেয়। সভায় বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি বলেন "শ্রমদাসত্ব থেকে মুক্তির লড়াই যে বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে হওয়া সম্ভব তা হল সমাজবিজ্ঞান। সমাজ ঐতিহাসিকভাবে বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই পরিবর্তন হয় এবং আগামী দিনেও তাই হবে। এই সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষায় শ্রমজীবী জনতাকে সচেতন করার দায় আমাদের কাঁধে নিতে হবে।"

বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রা ঃ গত ১৪ই এপ্রিল কলকাতার মৌলালী থেকে বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রায় বিগত বছরের ন্যায় বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনগতভাবে অংশ নেয়। আন্তর্জাতিকভাবে **'মার্চ ফর সায়েন্স'**-এর ডাকে এই পদযাত্রা হয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কর্মী এবং বিজ্ঞান প্রেমী মানুষ এই মিছিলে যোগ দেয়। দাবি ছিল – অবৈজ্ঞানিক ভাবধারা তথা অপবিজ্ঞান প্রচার রদ করতে হবে; বিজ্ঞানের গবেষণায় রাষ্ট্রের ব্যয় সংকোচন করা যাবে না; বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ বিবর্জিত কোন ফরমাণ শিক্ষার পাঠক্রমে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ইত্যাদি।

গত ৫ই জুন কলকাতার এন্টালি এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আয়োজিত তামিলনাড়ু'র তুতিকোরিনে বেদান্ত গ্রুপের স্টারলাইট তামা উৎপাদনকারী কারখানায় দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে রাষ্ট্রের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে একটি মিছিল ও পথসভা হয়। এই অনুষ্ঠানে আমাদের কর্মীরা অংশ নেয়।■

●১৩ *পৃষ্ঠা পরবর্তী অংশ*

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ?

'কমিউনিস্ট' সীতারাম ইয়েচুরির মাথায় পূজার কলস!

'ইয়ে ক্যায়া হুয়া, কব হুয়া, কিঁউ হুয়া' ক্যাপসন সহ ফুলসজ্জিত কলস মাথায় নিয়ে 'বোনালু' উৎসবে অংশ নেওয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী'র সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির ছবি এখন সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। তেলেঙ্গানার ধর্মীয় উৎসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **'বোনালু'** উৎস। এই উৎসবে ভক্তরা হিন্দু দেবী মহাকালীর প্রতি পূজা অর্পণ করেন মনবাসনা পূরণের জন্য। দেবীর কাছে পূজা নিবেদন করলে তিনি নাকি সব গ্লানি দূর করেন। সব পাপ ক্ষমা করেন, সব ইচ্ছা পূরণ করেন। সোস্যাল মিডিয়ায় নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলেছেন সীতারাম কোন ইচ্ছাপূরণে বোনালু উৎসবে মাথায় ফুলসজ্জিত পূজার কলস নিলেন? ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, নাকি পশ্চিমবঙ্গ-ত্রিপুরায় ক্ষমতায় ফেরা?

এইসব 'কুৎসা' প্রচারে ভয়ানক চটেছেন 'দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিবিড় অনুশীলনে প্রাজ্ঞ' 'কমিউনিস্ট' নেতারা! ইন্ডিয়া টু ডে কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গত জুলাই মাসের শেষে ওই পার্টির 'কমিউনিস্ট' নেতা শ্রী অতুল অঞ্জন বলেছেন "আর এস এস শুরুর থেকেই এই অভিযোগ করে আসছে যে কমিউনিস্টরা হল ধর্মবিরোধী। তাদের এই প্রচার আমাদের কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস ...।" মন্তব্য নিস্প্রয়োজন।■

বেহালা ঃ বাৎসরিক অনুষ্ঠান

দেওয়ানগঞ্জ ঃ বাৎসরিক অনুষ্ঠান

পাথরপ্রতিমা ঃ বাৎসরিক অনুষ্ঠান

বেহালা বইমেলা

দেওয়ানগঞ্জ ঃ বাৎসরিক অনুষ্ঠান
(মডেল প্রদর্শনী)

সোনারপুর বইমেলা

নিশ্চিন্দপুর ঃ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

দেওয়ানগঞ্জ ঃ পাথর প্রদর্শনী

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

চাঁদের মাটিতে নিশ্চিতভাবে জলের সন্ধান মিলল

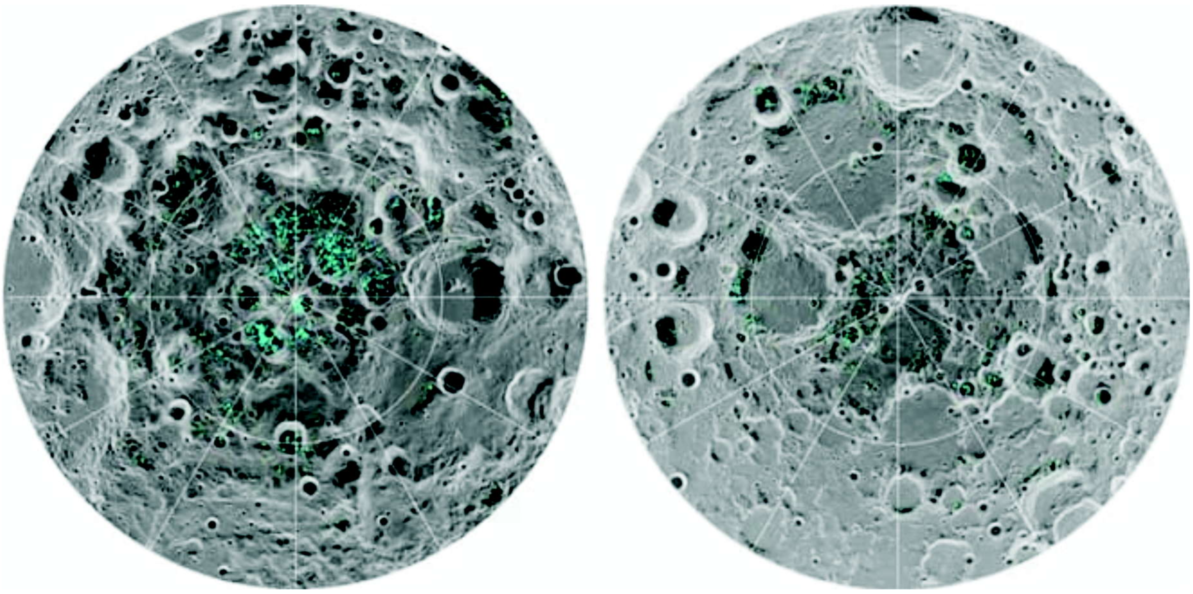

বহুকাল ধরে খোঁজ চলছে। এইবার নাসার মুন মিনারলজি ম্যাপার ইনস্ট্রুমেন্ট (M_3) দ্বারা চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে জলের সন্ধান মিলল। ছবিতে হালকা সবুজ বা নীল অংশ হল জল (জল বা H_2O-র বরফ), হাল্কা ধূসর বর্ণ চিহ্নিত করছে ভূত্বকের সাধারণ তাপমাত্রা আর গাঢ় ধূসর বর্ণ অপেক্ষাকৃত শীতল তাপমাত্রার অঞ্চল। বাঁ দিকের ছবিটি চাঁদের দক্ষিণ মেরু ও সংলগ্ন অঞ্চলের ছবি এবং ডান দিকের ছবিটি চাঁদের উত্তরমেরু ও সংলগ্ন অঞ্চলের ছবি (নাসা)। দক্ষিণ মেরুতে জল বা জলের বরফগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বা crater-এই মুখ্যত দেখা যাচ্ছে আর উত্তরমেরুতে জল বা বরফ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

এই মহাকাশ যন্ত্র M_3 চন্দ্রায়ণ-১ মহাকাশযানের উপর আছে যা ২০০৮ সালে ভারতের মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র ইসরো দ্বারা উৎক্ষেপিত হয়েছিল।

সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল এবং বিজ্ঞান প্রেমী মানুষ এই সংবাদে উল্লসিত। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২,
কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email ঃ samikshan2009@gmail.com Website ঃ www.samikshan.com সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা